অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ

আবদুস শহীদ নাসিম

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন ঃ ৭১১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১০১

২য় প্রকাশ

মহররম	১৪২৭
ফাল্গুন	১৪১২
ফেব্রুয়ারী	২০০৬

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১২.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

انسان کا معاشی مسئلہ اور اسکا اسلامی حل -এর বাংলা অনুবাদ
ORTHONAYTIK SAMOSSHAR ISLAMI SAMADHAN by Sayyed Abul A'la Maudoodi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 12.00 Only.

بسم الله الرحمن الرحيم

আমাদের কথা

আধুনিক বিশ্বে অর্থ অন্য সবকিছুর চাবিকাঠি হস্তগত করে কাণ্ডারির আসনে সমাসীন হয়ে আছে। তুচ্ছ কিছু থেকে নিয়ে শাসন ক্ষমতা দখল ও আধিপত্য বিস্তারের মূল নিয়ামক এখন অর্থ। অর্থ এখন দস্যি। অন্যসব নস্যি।

এ দস্যির ধকলে বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত। অর্থনৈতিক এ দানবীর পদতলে মানবতা পিষ্ট-ক্লিষ্ট। শাসন, ক্ষমতা, আধিপত্য, ভোগ-বিলাসের অবৈধ হাতিয়ার বানানো হয়েছে অর্থ-সম্পদকে। এ জন্যে চলছে উৎপাদন আর বাজার দখলের আধিপত্যবাদী ঠাণ্ডা লড়াই। উদ্ভাবন করা হচ্ছে নতুন নতুন থিওরী। লেখা হচ্ছে গাদা গাদা গ্রন্থ। প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে পেটুক পেটুক দাতা সংস্থা। নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে সুদী ঋণের। ফাঁদ ফেলে জালে আঁটকানো হচ্ছে মযলুম মানবতাকে।

অর্থ দানবীর ভাতার আর কুসন্তানরা মানুষকে বিত্তশালী আর বিত্তহীনে ভাগ করে বিশ্বে আজ কায়েম করেছে থাবাধারী দাঁতুক খাদকদের রাজত্ব। যেমন আপনি দেখে থাকেন হরিণদের অরণ্যে হায়েনাদের রাজত্ব।

তাই 'অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান' কথাটি পুঁজিবাদী, ভোগবাদী ও আধিপত্যবাদীদের সবচে' বড় গা-জ্বালার ভেজাল। ওদের কাছে এর সমাধান একটাই–'শুধু আমার চাই'।

মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিয়েছে একমাত্র ইসলাম। শুধুমাত্র ইসলাম। কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা, মানুষের যিনি স্রষ্টা।

সেই সমাধানের নির্দেশিকা দেখে নিন এ বইতে। তারপর কথা বলুন আপনার বিবেকের সাথে।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা।

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান[১]

১. অর্থনৈতিক সমস্যা

আধুনিককালে দেশ ও জাতি এবং সামষ্টিকভাবে গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক সমস্যার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সম্ভবত এর আগে এতোটা স্পষ্টভাবে এর উপর এতো অধিক গুরুত্ব আর কখনো দেয়া হয়নি। "স্পষ্টভাবে" শব্দটি এজন্যে ব্যবহার করেছি যে, আসলে মানুষের জীবনে তার জীবিকা যে পর্যায়ের গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে, প্রতিটি যুগেই ব্যক্তি, সমাজ, জাতি, দেশ এবং সমগ্র মানুষ এর প্রতি সে অনুযায়ী গুরুত্ব আরোপ করে এসেছে। কিন্তু বর্তমানকালে অর্থনৈতিক সমস্যার উপর যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা অতীতের সকল গুরুত্বকে ছাড়িয়ে গেছে। যে জিনিস এ গুরুত্বকে 'স্পষ্টতা' ও 'স্বাতন্ত্র্য' দান করেছে, তাহলো, আজকাল অর্থনীতি রীতিমতো একটি বিরাট শাস্ত্র হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। এর উপর বড় বড় গ্রন্থ রচিত হয়েছে। চমকপ্রদ অসংখ্য পরিভাষা সৃষ্টি হয়েছে, অর্থনীতির বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অগণিত জাঁকজমকপূর্ণ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান। আবার এর সাথে সাথে মানব জীবনের অপরিহার্য সামগ্রীর উৎপাদন, সংগ্রহ, সরবরাহ ও উপার্জনের পন্থা-পদ্ধতিও হয়ে উঠেছে জটিল থেকে জটিলতর। এসব কারণে আজ বিশ্বে অর্থনৈতিক সমস্যার উপর যে ব্যাপক আলোচনা, বিতর্ক, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিশ্লেষণ চলছে, তার তুলনায় মানব জীবনের অন্যান্য সকল সমস্যা যেন ম্লান হয়ে পড়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার যে, যে বিষয়ের প্রতি গোটা বিশ্বের দৃষ্টি এভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তার সহজ সুষ্ঠু সমাধান হওয়ার পরিবর্তে দিন দিন যেন আরো অধিক জটিল ও ধূম্রজালে পরিণত হচ্ছে। অর্থনীতি-বিজ্ঞানের জটিল জটিল পরিভাষা আর অর্থনীতিবিদদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ, গবেষণাপ্রসূত কথাবার্তা এ বিষয়ে জনগণকে রীতিমতো শংকিত ও আতংকিত করে তুলেছে। সাধারণ মানুষ এসব পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা ও বিতর্ক শুনে

---

১. গ্রন্থকার এ নিবন্ধটি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সমিতির' আমন্ত্রণে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রেচী হলে ১৯৪১ সালের ৩০ অক্টোবর তারিখে পাঠ করেন।

নিজেদের অর্থনৈতিক সমস্যার ভয়াবহতায় ভীত এবং তা সমাধানের সম্ভাবনা সম্পর্কে চরমভাবে নিরাশ হয়ে পড়েছে। কোনো রোগাক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসকের মুখে তার রোগের জটিল ল্যাটিন নাম শুনে যেমন ভীত বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং তার রোগমুক্তি সম্পর্কে নিরাশ হয়ে যায়, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্পর্কে একালের মানুষের অবস্থাও ঠিক তাই হয়েছে।

অথচ অর্থনীতির এসব পরিভাষা ও শাস্ত্রীয় বিতর্কের ধূম্রজাল অপসারণ করে বিষয়টিকে সাদাসিধে ও স্বাভাবিকভাবে দেখলে অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃত রূপ সহজেই উপলব্ধি করা যায় এবং এ সমস্যা সমাধানের জন্য বিশ্বে আজ পর্যন্ত যেসব উপায় পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোর সার্থকতা ও ব্যর্থতার দিকও অনায়াসেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাছাড়া এ সমস্যা সমাধানের সঠিক ও স্বাভাবিক পদ্ধতি কোন্‌টি তা বুঝতেও তেমন কষ্ট হয় না।

খণ্ডিত বিষয়পূজার বিপর্যয়

পূর্বেই বলেছি যে, পরিভাষা এবং শাস্ত্রীয় জটিলতার ভোজবাজি অর্থনৈতিক সমস্যাকে অত্যন্ত অস্পষ্ট ও দুরূহ করে তুলেছে। এ সমস্যা আরো অধিক জটিল হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক সমস্যাকে মানব জীবনের অন্যান্য সমস্যা থেকে পৃথক করে একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সমস্যা হিসেবে দেখার ফলে। বস্তুত মানব জীবনের অসংখ্য সমস্যার মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যা হচ্ছে একটি। কিন্তু সামগ্রিক জীবন থেকে অর্থনৈতিক সমস্যাকে পৃথক করে সম্পূর্ণ আলাদা একটি সমস্যা হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। ধীরে ধীরে এর স্বাতন্ত্র্য এমন পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক সমস্যাকেই মানব জীবনের একমাত্র সমস্যা মনে করা হচ্ছে। প্রথমোক্ত ভুল থেকে এটি অনেক বড় ভ্রান্তি। এর কারণেই এ সমস্যার গাঁট খোলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরো সহজে বোধগম্য হতে পারে। কোনো হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ যদি মানবদেহের সামগ্রিক কাঠামো থেকে হৃৎপিণ্ডকে আলাদা করে দেখতে শুরু করে এবং সেই কাঠামোর মধ্যে হৃদপিণ্ডের যে গুরুত্ব তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে হৃৎপিণ্ডকে নেহায়েত হৃৎপিণ্ড হিসেবে বিচার করে এবং শেষ

পর্যন্ত যদি সে হৃৎপিণ্ডকেই গোটা মানব দেহ বলে বিবেচনা করতে থাকে তাহলে কিরূপ মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হবে তা সহজেই অনুমেয়। এবার ভেবে দেখুন, মানব স্বাস্থ্যের গোটা সমস্যাকে যদি হৃৎপিণ্ডের চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করার চেষ্টা করা হয়, তবে এ সমস্যা কতোটা জটিল ও সমাধান অযোগ্য হয়ে পড়ে এবং বেচারা রোগীর জীবনই বা কতোটা বিপদসংকুল হয়ে পড়ে। এ দৃষ্টান্ত সামনে রেখে ভেবে দেখুন, যদি অর্থনৈতিক সমস্যাকে মানুষের অন্যসব সমস্যা থেকে বের করে এনে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে দেখা হয়, অতপর একে মানুষের একমাত্র সমস্যা বলে ধরা হয় এবং কেবল এর মাধ্যমেই জীবনের অন্যসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়, তাহলে এ থেকে বিভ্রান্তি আর হতাশা ছাড়া মানুষ আর কি পেতে পারে !

আধুনিক কালের অন্যান্য অনিষ্টের মধ্যে বিশেষজ্ঞ (Specialists) তৈরির অনিষ্ট একটি বড় অনিষ্ট। এর ফলে জীবন এবং সমস্যাবলীর উপর সামগ্রিক দৃষ্টি দিন দিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ছে। মানুষ এখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিশেষজ্ঞদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতি-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি গোটা জগতের জটিলতা ও সমস্যাবলী কেবল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মাধ্যমেই সমাধান করতে চায় ; যার মগজে মনোবিজ্ঞান চেপে বসেছে, সে শুধু মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই একটি পূর্ণ জীবন দর্শন রচনার প্রয়াস পায় ; যার দৃষ্টি যৌনতত্ত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হয়েছে, সে মনে করে গোটা মানব জীবন কেবল যৌনতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। এমনকি, মানুষের মধ্যে আল্লাহর সম্পর্কে বিশ্বাসও নাকি এ পথেই সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপভাবে যারা অর্থনীতি শাস্ত্রের গহীনে নিমগ্ন হয়েছে তারা মানুষের মনে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করতে চায় যে, জীবনের আসল ও মূল সমস্যা হলো অর্থনৈতিক সমস্যা ; অন্যসব সমস্যা এ মূল সমস্যারই শাখা প্রশাখা মাত্র। অথচ সত্য কথা হলো এসব সমস্যা হলো একটি পূর্ণাঙ্গ এককের বিভিন্ন অংশমাত্র। সেই পূর্ণাঙ্গ এককের মধ্যে এসব সমস্যার প্রত্যেকটিরই একটি নির্দিষ্ট অবস্থান রয়েছে। আর সেই অবস্থানের ভিত্তিতেই প্রতিটি সমস্যারই নির্দিষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। মানুষ একটি দেহের অধিকারী। আর এ দেহটি চলছে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে। এ হিসেবে মানুষ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়, কিন্তু মানুষ কেবল দেহ মাত্রই নয় ; তাই শুধু

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দ্বারা মানুষের সকল সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে না। মানুষ একটি প্রাণবিশিষ্ট সত্তা। তাই সে জৈবিক নিয়মের অধীন। এদিক থেকে মানুষ জীববিজ্ঞানেরও (Biology) বিষয়বস্তু। কিন্তু মানুষ কেবল একটি জীবই নয়। সুতরাং কেবল জীববিজ্ঞান বা প্রাণীবিজ্ঞান (Zoology) থেকে মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ আইনবিধান গ্রহণ করা যেতে পারে না। বেঁচে থাকার জন্যে মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন। এ হিসেবে অর্থনীতি মানব জীবনের একটি বড় অংশকে পরিবেষ্টন করে আছে। কিন্তু মানুষ কেবল পানাহার গ্রহণকারী, পোশাক পরিধানকারী এবং বাসস্থান নির্মাণকারী পশু নয়। তাই শুধুমাত্র অর্থনীতির উপর মানব জীবনদর্শনের ভিত রচনা করা যায় না। মানুষকে তার জাতি রক্ষার জন্যে বংশবৃদ্ধি করতে হয়। তাই তার মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড যৌন প্রবৃত্তি। এ হিসেবে মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের সাথে যৌন বিজ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু তাই বলে গোটা মানুষটি কেবল একটি বংশ বৃদ্ধির যন্ত্র নয় ; তাই শুধুমাত্র যৌন বিষয়ক চশমা দিয়ে তাকে দেখা সংগত হতে পারে না। মানুষের একটি মন আছে। এতে অনুভূতি ও চেতনা শক্তি এবং আবেগ, আকাঙ্ক্ষা ও লোভ-লালসা বর্তমান। এ হিসেবে মনোবিজ্ঞান মানুষের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু মানুষের আপাদমস্তক কেবল মন আর মন নয়। তাই শুধু মনোবিজ্ঞান দিয়ে তার জীবনের স্কীম তৈরি করা যেতে পারে না। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, তার প্রকৃতিই তাকে অন্য মানুষের সাথে মিলেমিশে জীবন যাপন করতে বাধ্য করে। এ হিসেবে মানব জীবনের একটি বড় অংশ সমাজ বিজ্ঞানের সাথে জড়িত। কিন্তু মানুষ নিছক একটি সামাজিক জীব মাত্রই নয়। তাই কেবল সমাজ বিজ্ঞানীরা তার জীবন ব্যবস্থা রচনা করতে পারে না। মানুষ একটি বুদ্ধিমান জীব। তার মধ্যে অনুভূতির ঊর্ধে বিবেক বুদ্ধির দাবীও রয়েছে। সে বিবেক বুদ্ধিগত প্রশান্তিও চায়। এ হিসেবে যুক্তিবিদ্যা তার একটি বিশেষ দাবী পূরণ করে। কিন্তু মানুষের গোটা সত্তা কেবল বুদ্ধি-বিবেক নয়। তাই কেবল তর্কশাস্ত্র দিয়ে তার জীবনের কর্মসূচী তৈরি করা যেতে পারে না। মানুষ একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তাও বটে। তাই অনুভূতি ও যুক্তির ঊর্ধে ভালমন্দ ও ন্যায় অন্যায়ের ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে বর্তমান। এ হিসেবে মানব জীবনের একটি অংশ জুড়ে রয়েছে নীতিবজ্ঞিান ও আধ্যাত্মতত্ত্ব কিন্তু মানুষ

কেবল নীতিবোধ ও আধ্যাত্মিকতা সর্বস্ব জীব নয়। তাই শুধুমাত্র নীতি বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মবিদ্যা দিয়ে তার জীবনব্যবস্থা রচিত হতে পারে না।

প্রকৃত ব্যাপার হলো, মানুষ একই সাথে এ সবগুলো বিষয়ের সমন্বয়। এ সবগুলো বিষয় তার মধ্যে যথাস্থানে বর্তমান রয়েছে ; এছাড়া মানব জীবনের আরো একটি বড় দিক রয়েছে ; তাহলো গোটা বিশ্বজগতের সামগ্রিক ব্যবস্থার সে একটি অংশও। তাই তার জীবনব্যবস্থা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে, গোটা জগতের সামগ্রিক ব্যবস্থায় তার অবস্থান কোথায় এবং এর একটি অংশ হিসেবে তার কি ধরনের কাজ করা উচিত ? তাছাড়া নিজ উদ্দেশ্য লক্ষ্য নির্ণয় করাও তার জন্যে অপরিহার্য। আর সে হিসেবে কি কাজ তার করা উচিত, সে সিদ্ধান্তও তাকে গ্রহণ করতে হবে। শেষোক্ত দুটি প্রশ্ন মানব জীবনের মৌলিক প্রশ্ন। এগুলোর ভিত্তিতেই রচিত হয় জীবনদর্শন। অতপর মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিশ্বের সকল জ্ঞান সেই জীবনদর্শনের অধীনেই নিজ নিজ পরিসরভুক্ত তথ্য ও জ্ঞান আহরণ করে এবং কমবেশী এ সবগুলোর সমন্বয়েই রচিত হয় মানব জীবনের কর্মসূচী। অতপর এর ভিত্তিতেই পরিচালিত হয় মানব জীবনের গোটা কাঠামো।

আপনি যদি আপনার জীবনের কোনো একটি সমস্যাকে বুঝতে চান, তবে দূরবীণ লাগিয়ে কেবল সে সমস্যার মধ্যে নিজের দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা যে কোনো সঠিক পন্থা নয়, সে কথাটা এতোক্ষণে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়েছে। এতে আরো স্পষ্ট হয়েছে যে, সমস্যাটির সাথে জড়িত জীবনের সেই নির্দিষ্ট বিভাগের প্রতি অন্ধ প্রবণতা নিয়ে গোটা জীবন সমস্যার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও সঠিক কাজ নয় ; বরং সে নির্দিষ্ট সমস্যাটিকে জীবন সমস্যার সামগ্রিক কাঠামোর মধ্যে তার অবস্থানের প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করার মাধ্যমেই তার সঠিক সমাধান উপলব্ধি করা যেতে পারে। বস্তুত বিচার বিশ্লেষণের এটাই নির্ভুল পন্থা। একইভাবে আপনি যদি জীবনের ভারসাম্যের মধ্যে কোনো বিকৃতি দেখতে পান এবং তা শোধরাতে চান, তবে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ, কোনো একটি সমস্যাকে সমগ্র জীবন সমস্যা ধরে নিয়ে একে কেন্দ্র করে জীবনের গোটা কারখানাকে ঘুরাতে

থাকলে যে বিপদ সৃষ্টি হবে তার চেয়ে বড় বিপদ আর কিছু হতে পারে না। এরূপ পদক্ষেপের মাধ্যমে তো আপনি গোটা ভারসাম্যকে বিনষ্টই করে দেবেন। সংশোধনের সঠিক পন্থা হলো, আপনাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবন কাঠামোকে তার মৌলিক দর্শনসহ প্রাসংগিক বিষয়াদি পর্যন্ত সবকিছু দৃষ্টিতে আনতে হবে এবং বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে কোথায় বিকৃতি সৃষ্টি হয়েছে আর তার ধরনই বা কি?

মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা বুঝা এবং যথার্থভাবে তা সমাধানের ক্ষেত্রে যে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে তার বড় কারণ হলো, কিছু লোক সমস্যাটিকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দেখছে। আবার কিছু লোক এর গুরুত্বের প্রতি এতোটা বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে যে, তারা এটাকেই মানব জীবনের একমাত্র সমস্যা বলে ধরে নিয়েছে। আবার অন্য কিছু লোকের বাড়াবাড়ির চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। তারা জীবনের মূল দর্শন, নৈতিকতা ও সমাজের গোটা কাঠামোকে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অথচ অর্থনীতিকে যদি মানব জীবনের মূলভিত্তি মনে করা হয়, তাহলে তো মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য আর একটি গরুর জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। একটি গরু চূড়ান্ত চেষ্টা সাধনা নিয়োজিত করে সবুজ শ্যামল ঘাস খেয়ে সুখী শক্তিমান জীবন এবং জগতের চারণভূমিতে স্বাধীন পশুর মর্যাদা লাভ করার জন্যে। মানুষও যদি কেবল অর্থনীতি সর্বস্ব হয়ে পড়ে তাহলে এ পশুটির সাথে তার আর কোনো পার্থক্য থাকে না।

অনুরূপভাবে নীতিবিদ্যা, আধ্যাত্মবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, সমাজ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং অন্যান্য সববিষয় ও শাস্ত্রের মাঝে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণকে প্রভাবশালী করার দ্বারা সাংঘাতিক বিপর্যয় ও ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হতে বাধ্য। কারণ, মানব জীবনের এ সকল বিভাগের ভিত্তি তো অর্থনীতি নয়। সবকিছুকে যদি অর্থনীতির ভিত্তির উপর দাঁড় করানো হয়, সে ক্ষেত্রে নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতা প্রবৃত্তিপূজা ও বস্তু পূজায় রূপান্তরিত হবে, যুক্তিবিদ্যা অন্নবিদ্যায়, সমাজ বিজ্ঞানের সমগ্র স্তর সামাজিক তত্ত্ব ও তথ্য বিচারের পরিবর্তে ব্যবসায়িক কার্যধারায় এবং মনোবিজ্ঞান মানসিকতা অধ্যয়নের পরিবর্তে মানুষকে নিছক অর্থনৈতিক জীব হিসেবে বিশ্লেষণ করার শাস্ত্রে রূপান্তরিত হতে

বাধ্য। এমতাবস্থায় মানবতার প্রতি এর চেয়ে বড় অবিচার আর হতে পারে না।

অর্থনৈতিক সমস্যা আসলে কি ?

আমরা যদি পরিভাষাগত এবং শাস্ত্রীয় জটিলতার ধূম্রজালকে একপাশে রেখে একেবারে সহজ, সরল ও সাধারণভাবে দেখি তাহলে সহজেই মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃত রূপ বুঝতে পারি। সমাজের বিবর্তন ও ক্রমোন্নতির ধারা অব্যাহত রেখে কিভাবে মানুষের অপরিহার্য জীবন সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায় ; কিভাবে সমাজের প্রতিটি মানুষকে তার সামর্থ ও যোগ্যতা অনুযায়ী উন্নত করা যায় এবং কিভাবে তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে যোগ্যতার চরম শিখরে পৌঁছার সুযোগ করে দেয়া যায়, আসলে তা-ই হলো মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার মূলকথা।

সুপ্রাচীনকালে মানুষের জীবিকার বিষয়টি ছিলো পশুপাখির জীবিকার মতোই সহজ ও জটিলতামুক্ত। আল্লাহর এ যমীনে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সীমাসংখ্যাহীন জীবন সামগ্রী। প্রতিটি সৃষ্টির জন্যে যা প্রয়োজন তার তুলনায় জীবিকার সরবরাহ ছিল অঢেল ও অগাধ। প্রত্যেকেই স্বীয় জীবিকার অন্বেষণে বের হতো আর পৃথিবীর ভাণ্ডার থেকে তা সংগ্রহ করে নিত। এজন্যে কাউকেও মূল্য পরিশোধ করতে হতো না। এক সৃষ্টির জীবিকা অপর সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধও ছিল না। প্রাচীনতমকালে মানুষের অবস্থাও প্রায় এ রকমই ছিলো। সে সময়ে মানুষ বেরিয়ে পড়তো আর প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করে নিতো নিজের প্রায়োজনীয় জীবিকা। এসব রুজি ছিল ফল মূল ও শিকার করা পশুপাখি। সে সময়ে মানুষ প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে ঢেকে নিতো নিজেদের শরীর। পৃথিবীর বুকে যেখানেই সুযোগ সুবিধা দেখতো, সেখানেই মাথা গোঁজার জন্যে জায়গা বানিয়ে নিতো।

কিন্তু এ অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকার জন্যে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ মানুষের মধ্যে এমন সৃজনশীল প্রতিভা ও আকাঙ্ক্ষা অন্তর্নিহিত করে দিয়েছেন যার ফলে মানুষ ব্যষ্টিক ও স্বতন্ত্র জীবন যাপনের রীতি পরিত্যাগ করে সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের প্রক্রিয়া অবলম্বন এবং নিজের কর্মকৌশলের মাধ্যমে প্রকৃতির সরবরাহকৃত উপকরণ ব্যবহার করে নিজেদের জীবন উপকরণকে আরো উন্নত করার প্রয়াস পেয়েছে। নারী

পুরুষের মাঝে স্থায়ী সম্পর্কের প্রকৃতিগত আকাঙ্ক্ষা, মানব শিশুর দীর্ঘ সময় ধরে মা-বাবার প্রতিপালনের মুখাপেক্ষী হওয়া, নিজ সন্তান-সন্ততি ও বংশের প্রতি মানুষের গভীর আকর্ষণ এবং রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের প্রতি মহব্বত ভালবাসা এসব প্রবণতা মানব প্রকৃতিতে এমনভাবে নিহিত রাখা হয়েছে যাতে মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। একইরূপে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত উপকরণে তুষ্ট না হয়ে কৃষি কাজের মাধ্যমে নিজের খাদ্য উৎপাদন, পত্রপল্লব দিয়ে দেহ আবৃত করার পরিবর্তে নিজের জন্যে শিল্পসম্মত পোশাক তৈরি, গুহায় থাকার উপর সন্তুষ্ট না থেকে ঘরবাড়ী বানানো এবং নিজের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে দৈহিক যন্ত্রপাতির উপর তুষ্ট না হয়ে লোহা, পাথর, কাঠ ইত্যাদির সাহায্যে যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা ইত্যাদি সবই প্রকৃতি মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত করে দিয়েছে। এরই অপরিহার্য ফল স্বরূপ মানুষ ধীরে ধীরে সমাজবদ্ধ হয়েছে। এটা মানুষের কোনো অপরাধ নয় ; বরঞ্চ এ-ই ছিলো মানব প্রকৃতির দাবী এবং সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা।

সামাজিক জীবনে প্রবেশের সাথে সাথে মানুষের জন্যে কিছু বিষয় অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। সে বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

এক ঃ ধীরে ধীরে মানুষের জীবনোপকরণের চাহিদা বেড়ে গেল। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের যাবতীয় চাহিদা নিজেই পূরণ করতে অসমর্থ হয়ে পড়লো। ফলে একজনের কিছু চাহিদা অন্যদের সাথে এবং অন্যদের কিছু চাহিদা তার সাথে সম্পর্কিত হলো এবং মানুষ পরস্পরের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লো।

দুই ঃ জীবন যাপনের অপরিহার্য সামগ্রীক বিনিময় (Exchange) রীতি চালু করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে বিনিময়ের একটি মাধ্যম (Medium of Exchange) নির্দিষ্ট হলো।

তিন ঃ প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী তৈরি করার জন্যে যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হলো এবং চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে মানুষ নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার এবং তা থেকে উপকৃত হতে লাগলো।

চার ঃ এসবের সাথে সাথে মানুষ এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে চাইলো যে, নিজের শ্রমের মাধ্যমে সে যেসব জিনিস লাভ করেছে, যেসব যন্ত্রপাতি

দিয়ে সে কাজ করছে, যে জমিতে সে ঘর বানিয়েছে এবং যেখানে সে নিজের পেশাগত কাজ করছে, সে সবকিছুই যেনো তার অধিকারে থাকে এবং তার মৃত্যুর পর ঐসব লোকেরাই যেনো এসবের স্বত্বাধিকারী হয়, যারা অন্যদের তুলনায় তার অধিকতর নিকটবর্তী।

এভাবে বিভিন্ন পেশার জন্ম হয়, ক্রয়-বিক্রয় ও দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ রীতি চালু হয়, মূল্য নিরূপণের মানদণ্ড হিসেবে মুদ্রার প্রচলন হয়, আন্তর্জাতিক আদান প্রদান এবং আমদানী রপ্তানীর সুযোগ সৃষ্টি হয়, নতুন নতুন উৎপাদন উপকরণ (Means of Production) আবিষ্কৃত হয় এবং স্বত্বাধিকার ও উত্তরাধিকার রীতি চালু হয়। এসবই ছিলো স্বাভাবিক এবং প্রকৃতির দাবী এবং এগুলোর মধ্যে কোনোটিই গুনাহর কাজ ছিল না যে, এখন তার জন্যে তাওবা করতে হবে।

এছাড়া মানব সমাজের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে নিম্নোক্ত জিনিসগুলোও অপরিহার্য হয়ে পড়ে ঃ

১. মানুষের শক্তি সামর্থ এবং যোগ্যতা প্রতিভার ক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহ যে পার্থক্য রেখে দিয়েছেন, তার ফলশ্রুতিতে কিছু মানুষ তার প্রকৃত চাহিদার চেয়ে অধিক উপার্জনে সক্ষম হওয়া, কিছু লোক চাহিদা মেটানোর মতো উপার্জন করা এবং আর কিছু লোক নিজেদের চাহিদা পূরণ করার মতো উপার্জন করতে না পারা স্বাভাবিক ছিল।

২. উত্তরাধিকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ সম্পত্তির কারণে কিছু লোকের জীবনের সূচনাই অগাধ উপায় উপকরণের মধ্যে হওয়া, কিছু লোক স্বল্প উপায় উপকরণ নিয়ে যাত্রা শুরু করা এবং আর কিছু লোক সহায় সম্বলহীন অবস্থায় নিঃসম্বল হয়ে জীবন যুদ্ধে নামাও অপরিহার্য ছিল।

৩. প্রাকৃতিক কার্যকারণেই প্রতিটি জনবসতিতে এমন কিছু লোকও বর্তমান থাকা স্বাভাবিক ছিল যারা জীবিকা উপার্জনের কাজে অংশগ্রহণে অযোগ্য এবং বিনিময়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জীবনসামগ্রী সংগ্রহ করতেও অক্ষম। যেমন ঃ শিশু, বৃদ্ধ, রোগী, অক্ষম প্রভৃতি।

৪. এছাড়া প্রত্যেক সমাজে এমন কিছু লোক থাকা স্বাভাবিক ছিল যারা সেবা গ্রহণ করবে, আর কিছু লোক থাকবে যারা সেবা প্রদান করবে। এভাবেই সৃষ্টি হবে স্বাধীন শিল্প কারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য এবং কৃষিকার্য; চালু হবে অপরের চাকুরী করা এবং শ্রম বিনিময়ের প্রথা।

মানব সমাজে এসবই ঘটেছে স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক কার্যকারণে। এসব অবস্থা সংগঠিত হবার কারণে এমন কোনো অন্যায় বা অপরাধ হয়নি যে, এখন সেগুলোকে উচ্ছেদের চিন্তা করতে হবে। সামাজিক বিপর্যয় ও বিকৃতির অন্যান্য কারণ থেকে যেসব অনিষ্ট সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলোর প্রকৃত কারণ নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়ে বহুলোক ঘাবড়ে যায়। ফলে কখনো ব্যক্তি মালিকানাকে, কখনো অর্থকড়িকে, কখনো যন্ত্রপাতিকে, কখনো মানুষের মধ্যে বিরাজমান স্বাভাবিক অসাম্যকে এবং কখনোবা সমাজকেই দায়ী করা হয়। কিন্তু আসলে এটা ভ্রান্ত মূল্যায়ন এবং রোগ ও ওষুধ নিরূপণের ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। মানব প্রকৃতির দাবী অনুসারে যে সামাজিক বিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে সমাজ কাঠামো যে রূপ পরিগ্রহ করে, তা প্রতিহত করার চেষ্টা করা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়। এরূপ চেষ্টায় সাফল্যের তুলনায় ধ্বংস ও অনিষ্টের আশংকাই অধিক। কিভাবে সামাজিক উন্নয়ন প্রতিহত করা যায়, কিংবা কিভাবে স্বাভাবিক রূপ কাঠামোকে পাল্টানো যায়—মানুষের আসল অর্থনৈতিক সমস্যা এটা নয়। বরঞ্চ তার আসল অর্থনৈতিক সমস্যা হলো, সমাজের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ধারাকে অক্ষুণ্ন রেখে সামাজিক যুল্ম অবিচার কিভাবে প্রতিহত করা যায়। 'প্রতিটি সৃষ্টি তার জীবিকা লাভ করুক'—প্রকৃতির এ উদ্দেশ্য কিভাবে পূর্ণ করা যায় এবং কিভাবেই বা সেসব প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায়, যেগুলোর কারণে কেবল উপায় উপকরণ নেই বলে অসংখ্য মানুষের শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতা প্রতিভা বিনষ্ট হয়ে যায় ; মূলত এগুলো হচ্ছে মানুষের সত্যিকার অর্থনৈতিক সমস্যা।

২. অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আসল কারণ

এবার আমরা দেখবো, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিকৃতি ও বিপর্যয়ের সত্যিকার কারণ কি আর এ বিকৃতি ও বিপর্যয়ের ধরনই বা কি ?

মূলত, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিকৃতি ও বিপর্যয়ের সূচনা হয় স্বার্থপরতার ক্ষেত্রে বেপরোয়া সীমালংঘন থেকে। অতপর অন্যান্য নৈতিক অসাধুতা এবং ভ্রান্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাহায্যে এ বিকৃতি-বিপর্যয় আরো বৃদ্ধি এবং প্রসার লাভ করে। এমনকি, তা গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে জীবনের অন্যান্য বিভাগেও তার বিষাক্ত ছোবল সম্প্রসারিত করে থাকে। আমি একটু আগেই বলেছি, ব্যক্তি

মালিকানা এবং কিছু লোকের তুলনায় অপর কিছু লোকের আর্থিক অবস্থা ভালো হওয়া মূলত প্রকৃতিরই দাবী এবং অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। এটা মূলত কোনো প্রকার অনিষ্টের কারণ নয়। মানুষের সকল নৈতিক গুণবৈশিষ্ট্য যদি সুসামঞ্জস্যের সাথে কাজ করার সুযোগ পায় আর বাইরেও যদি ইনসাফ ও সুবিচার ভিত্তিক একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে এ দুটি জিনিস থেকে কোনো প্রকার অনিষ্ট সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু স্বাভাবিক কারণে যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল তাদের স্বার্থপরতা, সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি, অনিষ্ট চিন্তা, কার্পণ্য, লোভ-লালসা, দুর্নীতি এবং প্রবৃত্তিপূজার ফলে এগুলোকে অনিষ্ট সৃষ্টির কারণ বানিয়ে দিয়েছে। শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিয়ে বুঝিয়েছে যে, প্রকৃত প্রয়োজনের চেয়ে অধিক যেসব অর্থসামগ্রী তোমাদের হাতে আসে এবং যেগুলো তোমাদের মালিকানাভুক্ত হয়, সেগুলো ব্যয়-বিনিয়োগের সঠিক এবং যুক্তিসংগত খাত হলো দুটি ঃ এক, সেগুলো নিজের আরাম আয়েশ, বিলাসিতা, আনন্দ স্ফূর্তি এবং সুখ স্বাচ্ছন্দের কাজে ব্যয় করবে। আর দ্বিতীয় হলো, আরো অধিক অর্থসামগ্রীর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে সেগুলোকে বিনিয়োগ করবে এবং সম্ভব হলে এগুলোর মাধ্যমে মানুষের প্রভু এবং অন্নদাতা হয়ে বসবে।

প্রবৃত্তিপূজা এবং বিলাসিতা

শয়তানের এ পয়লা শিক্ষার পরিণতি এই দাঁড়ালো যে, সম্পদশালী সমাজের সেসব লোকের অধিকার মেনে নিতে অস্বীকার করলো যারা বঞ্চিত কিংবা যারা প্রয়োজনের তুলনায় কম সম্পদ লাভ করেছে। তারা এ লোকগুলোকে ক্ষুধা, দারিদ্র ও দূরবস্থায় নিক্ষেপ করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করলো না। নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টির কারণে তারা একথা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলো যে, তাদের আচরণের ফলে সমাজের বহু মানুষ অপরাধের কাজে লিপ্ত হতে পারে, অনেকে নৈতিক অধঃপতনের গহ্বরে নিমজ্জিত হতে পারে এবং শারীরিক দুর্বলতা ও রোগব্যাধির শিকার হতে পারে। ফলে তারা তাদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি ও যোগ্যতা প্রতিভা বিকশিত করা এবং সমাজ সভ্যতার উন্নতিতে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম হয়ে পড়বে। এতে সামষ্টিকভাবে সেই সমাজটিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে ধনীগণ নিজেরাও যার অংশ। সমাজের বিত্তশালী সদস্যরা এতোটুকু করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরঞ্চ এরা নিজেদের

প্রকৃত প্রয়োজনের উপর আরো অসংখ্য প্রয়োজনকে সংযোজন করে নিয়েছে। আর নিজেদের দুষ্ট প্রবৃত্তির মনগড়া এসব উদগ্র কামনা বাসনা পূরণের জন্যে তারা এমন অসংখ্য মানুষকে নিয়োজিত করেছে যাদের যোগ্যতা প্রতিভা সমাজ সভ্যতার কল্যাণময় সেবায় ব্যবহৃত হতে পারতো। জ্বিনা-ব্যভিচারকে তারা নিজেদের জন্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজ বানিয়ে নিয়েছে। আর এ লালসা চরিতার্থ করার জন্য তারা অসংখ্য নারীকে দেহব্যবসা ও রূপ-যৌবনের বিপণি সাজাতে বাধ্য করলো। গানবাজনাকে তারা তাদের অপরিহার্য প্রয়োজনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে নিল। এজন্যে তৈরি করা হলো গায়ক-গায়িকা, নর্তকী এবং বাদকদের দল ; বহু লোককে নিয়োগ করা হলো এ বাদ্যযন্ত্র তৈরির কাজে। তাদের আনন্দ-স্ফূর্তি ও চিত্তবিনোদনের জন্য নানা ধরনের ভাঁড়, রসিক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, গাল্পিক, অংকনশিল্পী, চিত্রশিল্পী এবং অন্যান্য অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় পেশা ও পেশাদারের জন্ম হলো। এসব ধনশালীদের বিলাস চরিতার্থ করার জন্যে অগণিত লোককে ভালো ও কল্যাণময় কাজের পরিবর্তে বনের পশুপাখি তাড়িয়ে ফেরার কাজে নিযুক্ত করা হয়। তাদের আনন্দ-স্ফূর্তি ও নেশার প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে অসংখ্য মানব সন্তানকে নিয়োগ করা হয় মদ, কোকেন, আফিম এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য তৈরি ও সরবরাহের কাজে। মোটকথা, এভাবে শয়তানের এসব সাথীরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্দয়ভাবে সমাজের একটি বিরাট অংশকে শুধুমাত্র নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক ধ্বংসের গহ্বরে নিমজ্জিত করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরঞ্চ আরো অগ্রসর হয়ে সমাজের আরেকটি বড় অংশকে সঠিক ও কল্যাণময় কাজ থেকে তাড়িয়ে নিয়ে অর্থহীন, অপমানকর ও ক্ষতিকর কাজে নিযুক্ত করেছিল। সমাজের গতিকে এর সঠিক ও ন্যায়সংগত পথ থেকে বিচ্যুত করে এমন পথে পরিচালিত করলো, যা মানবতাকে নিয়ে যায় ধ্বংসের অতল গহ্বরে। সম্পদশালীদের যুল্‌ম, অবিচার ও ধ্বংসাত্মক কার্যধারার এখানেই শেষ নয়। তারা কেবল মানবীয় মূলধনকে (Human Capital) অপচয় ও ধ্বংস করেছে তাই নয়। বরং সেই সাথে তারা বস্তুগত মূলধনকেও ভ্রান্ত পথে বিনিয়োগ ও ব্যয় ব্যবহার করেছে। নিজেদের প্রয়োজনে তারা বড় বড় প্রাসাদ, অন্দরমহল, গুলবাগিচা, প্রমোদকুঞ্জ, নৃত্যশালা, নাট্যশালা, প্রেক্ষাগার এমনকি মরার পর সমাধির জন্যও তারা বিরাট ভূমিখণ্ডের

উপর জাঁকজমকপূর্ণ সমাধিসৌধ নির্মাণ করে নিল। এভাবে আল্লাহর অসংখ্য বান্দার বাসস্থান ও জীবিকার জন্যে যে জমি ও দ্রব্যসামগ্রী কাজে লাগাতে পারতো, তা মাত্র গুটিকয়েক বিলাসী ব্যক্তির পৃথিবীতে জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থান ও বিদায়ের ব্যবস্থা করার জন্যে ব্যয় করা হলো। দামী দামী অলংকার, মনোরম পোশাক, উঁচুদরের সাজসজ্জা, সৌন্দর্য ও বিলাসিতার সামগ্রী, জাঁকালো মডেলের যানবাহন এবং আরো অনেক জানা অজানা বাহারী সামগ্রীর জন্য তারা অঢেল সম্পদ ব্যয় করলো। এমনকি, এসব যালিমরা জানালা দরজায় দামী দামী পর্দা ঝুলালো, ঘরের দেয়ালগুলোতে বহু টাকা ব্যয় করে ছবি ও চিত্র এঁকে নিলো, ঘরের মেঝেতে বিছিয়ে দিলো হাজার হাজার টাকা মূল্যের কার্পেট ও গালিচা। তারা তাদের কুকুরগুলোকে পর্যন্ত মখমলের পোশাক আর সোনার শিকল পরিয়ে দিলো। এভাবে বিপুল পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী এবং অসংখ্য মানুষের শ্রম ও সময় যা দুঃস্থ মানুষের দেহাচ্ছাদন ও ক্ষুধা নিবৃত্ত করার কাজে লাগতে পারতো, তা মাত্র গুটিকয়েক বিলাসী ব্যক্তি ও প্রবৃত্তির দাসানুদাসের লালসা চরিতার্থ করার জন্যে নিঃশেষ হয়ে গেলো।

বস্তুপূজা

এযাবত যে মারাত্মক চিত্র তুলে ধরলাম, এসবই হলো শয়তানী নেতৃত্বের মাত্র একটি দিকের পরিণতি। শয়তানী নেতৃত্বের অন্য দিকটির পরিণতি এর চেয়েও ভয়াবহ। প্রকৃত প্রয়োজনের অধিক যে সম্পদ ও উপায় উপকরণ কোনো ব্যক্তির হস্তগত হয়েছে, সেগুলোকে 'জমিয়ে রাখবে এবং আরও সম্পদ অর্জনের কাজে বিনিয়োগ করবে' এ নীতি একেবারেই ভ্রান্ত। একথা সুস্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ পৃথিবীতে যেসব উপায় উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, তা সৃষ্টিজগত ও মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ করার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। সৌভাগ্যক্রমে তোমার হাতে যদি কিছু অধিক অর্থসম্পদ এসে গিয়ে থাকে, তবে জেনে রেখো এটা অপরের অংশই তোমার হাতে এসেছে। তুমি কেন তা জমিয়ে জমিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ছো ? তোমার চারপাশে তাকাও, দেখবে যারা তাদের জীবিকা সংগ্রহ করতে অক্ষম, কিংবা যারা তাদের জীবিকা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে, অথবা যারা নিজেদের প্রকৃত প্রয়োজনের চেয়ে কম পেয়েছে, মনে করবে এরাই হলো সেইসব লোক যাদের জীবিকার অংশ তোমার হাতে এসে

গেছে। তারা তা আহরণ করতে পারেনি ; সুতরাং তুমি নিজেই তা তাদের পৌছে দিও। এটাই হচ্ছে সঠিক কর্মনীতি। এর পরিবর্তে তুমি যদি সে সম্পদকে আরো অধিক সম্পদলাভের কাজে ব্যবহার করো তবে তা হবে এক চরম ভ্রান্তি। কেননা এগুলোর সাহায্যে তুমি আরো যতো সম্পদই করবে, তাতো তোমার প্রয়োজনের চাইতে আরো অনেক বেশীই হবে। সুতরাং সম্পদের পর সম্পদলাভ করে সেগুলোর মাধ্যমে তোমার বিকৃত লোভ লালসা আর কামনা বাসনা চরিতার্থ করা ছাড়া কল্যাণকর আর কি হতে পারে ! তুমি তোমার সময়, শ্রম এবং যোগ্যতার যতোটা অংশ প্রয়োজনীয় জীবিকালাভের কাজে ব্যয় করো, মূলত ততোটুকুই কেবল এগুলোর সঠিক ও যুক্তিসংগত প্রয়োগ। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদলাভের জন্যে সেগুলোকে কাজে লাগালে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তুমি একটি অর্থনৈতিক পশু, বরং অর্থ উপার্জনের একটি মেশিন ছাড়া আর কিছু নও। অথচ তোমার সময়, শ্রম এবং মানসিক ও দৈহিক যোগ্যতা অর্থ উপার্জনের কাজে প্রয়োগ করা ছাড়াও আরো অনেক মহান ও উত্তম প্রয়োগক্ষেত্র রয়েছে। সুতরাং বিবেক বুদ্ধি ও স্বভাব প্রকৃতির দিক থেকে এ নীতি একেবারেই ভ্রান্ত, যা শয়তান তার শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছে। তাছাড়া এ নীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্যে যে কর্মপন্থা তৈরি করা হয়েছে সেটা এতোই অভিশপ্ত এবং এর পরিণাম ফল এতোই ভয়াবহ যে, তা কল্পনা করাও কষ্টকর।

প্রয়োজনের অধিক অর্থসম্পদকে আরো অধিক অর্থসম্পদ কবজা করার কাজে দুভাবে বিনিয়োগ করা যায় ঃ

এক. সুদের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা ;

দুই. ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্প কারখানায় বিনিয়োগ করা।

ধরনগত দিক থেকে উভয় পদ্ধতির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য অবশ্যি আছে। কিন্তু উভয় পদ্ধতির সমন্বিত কর্মের অনিবার্য পরিণতিতে সমাজ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

একটি শ্রেণী হলো তারা, যারা নিজেদের প্রকৃত প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী অর্থসম্পদের মালিক হয় এবং সে সম্পদকে আরো বেশী সম্পদ আহরণের কাজে অর্থাৎ সম্পদের পাহাড় গড়ার কাজে বিনিয়োগ করে। এ শ্রেণীর লোকেরা সংখ্যায় কম হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণীটি হলো তারা, যারা নিজেদের প্রকৃত প্রয়োজনের সমান বা তার চেয়ে কম অর্থসম্পদের অধিকারী হয়, কিংবা একেবারে বঞ্চিত হয়ে থাকে। এ শ্রেণীটি সংখ্যায় প্রথমোক্ত শ্রেণীর তুলনায় অনেক বেশী হয়।

উভয় শ্রেণীর স্বার্থ সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী, পরস্পর বিরোধী এবং সাংঘর্ষিক। শুধু তাই নয়, বরং উভয় শ্রেণীর মাঝে সম্পর্ক হয়ে থাকে সংঘাতময়, দ্বন্দ্বমুখর এবং প্রতিবাদী। এভাবেই প্রকৃতি মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যে সুস্থ ও সম্মতিপূর্ণ বিনিময় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তা সংঘাত ও শত্রুতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার (Antagonistic Compitition) উপর ভিত্তিশীল হয়ে পড়ে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক (ANTAGONISTIC COMPITITION) **অর্থব্যবস্থা**

অতপর এ সংঘাতময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা যতোই বাড়তে থাকে, ততোই ধনীক শ্রেণীর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে এবং দরিদ্র শ্রেণীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। এ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রকৃতিই এমন যে, এতে বিত্তশালীরা তাদের সম্পদের জোরে কম বিত্তের মালিকদের কাছ থেকে সম্পদ চুষে নেয় এবং তাদেরকে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের দলে ঠেলে দেয়। এভাবে দিন দিন বিশ্বের অর্থসম্পদ স্বল্প থেকে স্বল্পতর সংখ্যক লোকের হাতে কুক্ষিগত হতে থাকে এবং অধিক থেকে অধিক লোক দিন দিন নিঃস্ব ও দরিদ্র হয়ে যায় কিংবা ধনীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

প্রথমদিকে এ সংঘাতের সূচনা হয় স্বল্প পরিসরে। অতপর এর পরিধি বাড়তে বাড়তে দেশ হতে দেশে এবং জাতি হতে জাতিতে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি ক্রমে গোটা বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলে। এ প্রক্রিয়া এখানেই শেষ হয় না ; এরপরও 'আরও চাই আরও চাই' বলে যেন চিৎকার করতে থাকে। যে প্রক্রিয়ায় এ বৈষম্য সংঘটিত হয়, তাহলো, কোনো একটি দেশের কিছু লোকের হাতে যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থসম্পদ থাকে তখন তারা উদ্বৃত্ত অর্থসম্পদকে লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করে এবং এ অর্থ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের কাজে ব্যয় হতে থাকে। এখন তাদের বিনিয়োগকৃত পুঁজি লাভসমেত উঠে আসাটা নির্ভর করে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী সে দেশের ভেতরে বিক্রি হওয়ার উপর। কিন্তু বাস্তবে এমনটি সর্বদা হয় না এবং মূলত তা হতে পারেও না। কারণ

যাদের হাতে প্রয়োজনের চেয়ে কম সম্পদ রয়েছে তাদের ক্রয়ক্ষমতা তো ক্ষীণই হয়ে থাকে। তাই প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা দরকারী জিনিস ক্রয় করতে পারে না। অপরদিকে যাদের কাছে অতিরিক্ত সম্পদ থাকে তারা তাদের আয়ের একটি বিরাট অংশ অধিক মুনাফা অর্জন করার কাজে বিনিয়োগ করে। তাই তারা নিজেদের সাকুল্য মূলধন পণ্য ক্রয়ের জন্যে ব্যয় করে না। ফলে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর একটি বিরাট অংশ অনিবার্যভাবে অবিক্রিত থেকে যায়। অন্য কথায় এর অর্থ হলো, ধনীদের বিনিয়োগকৃত অর্থের একটি অংশ অনাদায়ী থেকে যায়। এ অর্থ দেশের শিল্পের (Industry) নিকট ঋণ হিসেবে পাওনা থাকে। এ হচ্ছে একটি মাত্র আবর্তনের অবস্থা। এভাবে যতোবারই পুঁজি আবর্তিত হয় ততোবারই পুঁজিপতিরা তাদের লব্ধ আয়ের একটি অংশ আবার লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করবে এবং প্রত্যেক আবর্তনেই অনাদায়ী অর্থের পরিমাণও বাড়তে থাকবে। এভাবে দেশীয় শিল্পের কাছে এ ধরনের ঋণ দ্বিগুণ, চারগুণ, হাজারগুণ বৃদ্ধি পায় যা স্বয়ং সেই রাষ্ট্রের পক্ষেও কখনো আদায় করা সম্ভব হয় না। এ প্রক্রিয়ায় এককেটি দেশ দেউলিয়াত্বের চরম বিপদে নিপতিত হয়। এ অবস্থা থেকে বাঁচার একটিই মাত্র উপায় থাকে। তাহলো, দেশের মধ্যে অবিক্রিত থেকে যাওয়া সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী বহির্বিশ্বে বিক্রির ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ এমন দেশের সন্ধান করা যার ঘাড়ে নিজের দেউলিয়াত্ব চাপিয়ে দেয়া যায়।

এভাবেই এ সংঘাতময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেশের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ময়দানে পদার্পণ করে। একথা স্পষ্ট যে, কেবল একটি মাত্র দেশই শয়তানী অর্থনীতি অনুসারে পরিচালিত হয় না, বরঞ্চ বিশ্বের অসংখ্য দেশে এ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। প্রত্যেক দেশই নিজেকে দেউলিয়াপনা থেকে বাঁচানোর জন্যে, অন্য কথায় নিজের দেউলিয়াত্ব অপর কোনো দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার জন্যে বাধ্য হয়ে পড়েছে। এভাবেই আরম্ভ হয় আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আর এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কয়েকটি রূপ ধারণ করে।

প্রথমত, প্রত্যেক দেশ আন্তর্জাতিক বাজারে নিজের দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্যে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। প্রত্যেকেই স্বল্পতম ব্যয়ে অধিক পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা করে। তাই শ্রমিক কর্মচারীদের অত্যন্ত কম পারিশ্রমিক

দেয়া হয়। ফলে দেশের অর্থনৈতিক কারবারে সাধারণ জনগণ এতোটা কম আয় লাভ করে, যা দিয়ে তাদের প্রকৃত প্রয়োজনও পূরণ হয় না।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক দেশ নিজের পরিসীমা ও নিজ প্রভাব বলয়ের অধীন দেশসমূহে অপর দেশের পণ্যসামগ্রী আমদানীর উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। নিজের আয়ত্তাধীন সব ধরনের কাঁচামালের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, যাতে অপর কোনো দেশ তা হস্তগত করতে না পারে। এর ফলে শুরু হয় আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বসংঘাত যার পরিণতিতে বেজে উঠে যুদ্ধের দামামা।

তৃতীয়ত, যেসব দেশ অপর দেশ কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া দেউলিয়াত্বের বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, তাদের উপর অসংখ্য লুটেরার দল হিংস্র স্বাপদের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরা সে দেশে কেবল নিজ দেশের উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রি করে তাই নয় বরং নিজ দেশে যেসব ধনসম্পদ লাভজনক কাজে খাটানোর সুযোগ নেই, তাও অধিক মুনাফা লুটার উদ্দেশ্যে সেসব দেশে বিনিয়োগ করে। শেষ পর্যন্ত এসব দেশেও সেই একই সমস্যা সৃষ্টি হয়, যা প্রথমত নিজ দেশে অর্থ বিনিয়োগকারী দেশগুলোতে সৃষ্টি হয়েছিল। অর্থাৎ যে পরিমাণ অর্থ তারা এসব দেশে বিনিয়োগ করে তা পুরোটা উদ্ধার হয়ে আসে না। আবার এ বিনিয়োগ থেকে যে পরিমাণ আয়ই হাতে আসে তার একটা বড় অংশ তারা অধিকতর লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করে। শেষ পর্যন্ত দেশগুলোর ঘাড়ে ঋণের বোঝা এতোটা বৃদ্ধি পায়, যা গোটা দেশকে নগদ দামে বিক্রি করেও আদায় করা সম্ভব হয় না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এরূপ আবর্তন চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত গোটা বিশ্ব দেউলিয়া হয়ে পড়বে। তখন এ দেউলিয়াত্বের বোঝা চাপিয়ে দেবার মতো কোনো দেশই আর বিশ্বের বুকে অবশিষ্ট থাকবে না। এমনকি শেষ পর্যন্ত অর্থ বিনিয়োগ এবং উদ্বৃত্ত পণ্য চালানোর জন্যে বুধ, বৃহস্পতি কিংবা মংগলগ্রহে ছুটোছুটি করতে হবে বাজারের সন্ধানে।

আরো কতিপয় ব্যবস্থা

এ সর্বগ্রাসী দ্বন্দ্বসংঘাতের ব্যাংক মালিক, আড়তদার, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের ক্ষুদ্র একটি দল গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ

এমনভাবে করায়ত্ত করে বসে আছে যে, তাদের মুকাবিলায় সমগ্র বিশ্বের মানবজাতি সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তির পক্ষে তার দৈহিক শ্রম ও মনমস্তিষ্কের যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে স্বাধীনভাবে উপার্জনের কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আল্লাহর এ রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা জীবনসামগ্রী থেকে নিজের অংশ সংগ্রহ করা তার জন্যে একেবারেই দুষ্কর। ছোট ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক এবং সাধারণ কৃষিজীবীদের পক্ষে পরিশ্রম করে প্রয়োজন মেটানোর মতো উপার্জন করার কোনো সুযোগ আজ তার অবশিষ্ট নেই। অর্থনৈতিক জগতের এ অধিপতিদের গোলাম, চাকর এবং মজুর হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। ওদিকে শিল্পপতি, পুঁজি-মালিক ও ব্যবসায়ীরা অপেক্ষাকৃত স্বল্প জীবিকার বিনিময়ে মানুষের দৈহিক ও মানসিক সকল শক্তি ও যোগ্যতা প্রতিভা এবং গোটা সময় ক্রয় করে নিচ্ছে। ফলে গোটা মানবজাতি এখন নিছক একটি অর্থনৈতিক পশুতে পরিণত হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক সংগ্রামের চাপে পড়ে নিজের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধি বৃত্তিক উৎকর্ষ সাধন করা, ক্ষুধা নিবারণের চেয়ে উচ্চতর কোনো উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্যারোপ করা এবং জীবিকার সন্ধান ছাড়া অন্য কোনো মহত্তর উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তিকে বিকশিত করা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে, এ শয়তানী ব্যবস্থার দরুন অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব সংঘাত এতোই কঠিন রূপ ধারণ করেছে যে, জীবনের অন্যসব দিক ও বিভাগ একেবারেই মুহ্যমান ও অকেজো হয়ে পড়েছে।

মানুষের আরো দুর্ভাগ্য যে, বিশ্বের নৈতিক দর্শন, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং আইন প্রণয়ন নীতিও এ শয়তানী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাবে চরমভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত সকল দেশে নীতিশাস্ত্রের শিক্ষকবৃন্দ মিতব্যয়িতা ও ব্যয় সংকোচনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করছেন যা আয় হবে তার পুরোটা ব্যয় করাকে বোকামী এবং নৈতিক ত্রুটি বলে মনে করা হচ্ছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, স্বীয় আয়ের কিছু না কিছু অংশ বাঁচিয়ে বা ব্যাংকে জমা রাখতে হবে, কিংবা বীমা পলিসি ক্রয় অথবা কোনো কোম্পানীর শেয়ার কিনতে হবে। বস্তুত মানবতার জন্যে যা ধ্বংসকর ও মারাত্মক, নীতিশাস্ত্রের দৃষ্টিতে তাকেই আজ সত্য ও সৌন্দর্যের মাপকাঠি বানানো হয়েছে।

রাষ্ট্রশক্তির কথা আর কি বলবো ? বাস্তবে রাজনীতি ও রাষ্ট্রশক্তি পুরোপুরিই শয়তানী ব্যবস্থার করায়ত্ত হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে যুল্‌ম ও শোষণ থেকে মানবতাকে রক্ষা করাই ছিল রাষ্ট্রশক্তির দায়িত্ব ; কিন্তু আজ স্বয়ং রাষ্ট্রশক্তিই যুল্‌ম ও শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। চতুর্দিকে শয়তানের দোসররাই নিরংকুশভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে আছে।

একইভাবে বিশ্বের আইনকানুনও এ শয়তানী ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছে। এসব আইন কার্যত মানুষকে পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী বানিয়ে দিয়েছে। ফলে মানুষ যেভাবে পারে সমাজ স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যথেচ্ছ চেষ্টা করছে। উপার্জনের ক্ষেত্রে বৈধ অবৈধ বাছবিচার প্রায় তিরোহিত হয়ে গেছে। অন্য লোকের সম্পদ শোষণ ও লুণ্ঠন করা কিংবা অন্যকে ধ্বংস করে নিজে অর্থশালী হবার সকল উপায় পন্থাকে আজ আইনের দৃষ্টিতে বৈধ করা হয়েছে। মদ উৎপাদন এবং মদের ব্যবসা, চরিত্রহীনতার আখড়া তৈরি করা, কামোদ্দীপক ফিল্ম বানানো, অশ্লীল ফিচার ও প্রবন্ধ লেখা, যৌন উত্তেজনামূলক ছবি প্রকাশ করা, জুয়ার আড্ডা বসানো, সুদী প্রতিষ্ঠান কায়েম করা, জুয়ার নিত্য নতুন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা, মোটকথা মানবতাকে ধ্বংসকারী যাকিছু করা হোক না কেন, এর কোনোটাই আইন বিরোধী নয়। আইন এসব করার শুধু যে অনুমতি দেয় তাই নয় ; বরং এসব করার অধিকার সংরক্ষণের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। অতপর এসব উপায়ে অর্জিত ধনসম্পদ যখন কারো কাছে জমা হয়, তখন তার মৃত্যুর পরও যাতে উক্ত সম্পদ সেখানেই কুক্ষিগত থাকে, আইন তারও ব্যবস্থা করে দেয়।

এজন্যে আইনে জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকার প্রথা (Rule of primogeniture), কোনো কোনো ক্ষেত্রে পালকপুত্র গ্রহণের বিধান এবং যৌথপরিবার প্রথার (Joint family system) ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব আইনের উদ্দেশ্য হলো, ধনভাণ্ডারের মালিক একটি অজগরের মৃত্যু হলে, আর একটি অজগরকে তার জায়গায় বসিয়ে দেয়া। আর দুর্ভাগ্যবশত সেই অজগর যদি কোনো বাচ্চা রেখে না যায়, তবে অন্যের একটি বাচ্চা ধার করে সেখানে বসিয়ে দেয়া হয়, যাতে সঞ্চিত ধনভাণ্ডার সমাজে ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

৩. মানব মস্তিষ্ক প্রসূত বিভিন্ন ব্যর্থ সমাধান

এসব কারণে আজ গোটা মানবজাতির জন্যে সৃষ্টি হয়েছে এক বিরাট জটিল ও দুরূহ সমস্যা। আল্লাহর এ দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন সামগ্রীর ব্যবস্থা কিভাবে করা যায়, আর প্রতিটি মানুষের সামর্থ্য, যোগ্যতা ও প্রতিভা অনুযায়ী উন্নতি লাভ এবং স্বীয় ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করার সুযোগ করে দেয়ার উপায়ই বা কি হতে পারে তার ব্যবস্থা করাই আজ মূল বিষয়। এ প্রসংগে মানুষ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমাধান প্রস্তাব পেশ করেছে।

সমাজতন্ত্রের প্রস্তাবিত সমাধান

সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের একটি রূপ পরিকল্পনা পেশ করেছে। সমাজতন্ত্রের মতে অর্থসম্পদ ও উৎপাদনের যাবতীয় উপায় উপকরণ ব্যক্তির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জাতীয় মালিকানায় অর্পণ এবং ব্যক্তিদের মধ্যে প্রয়োজনীয় জীবনসামগ্রী বণ্টন করার দায়িত্ব সমাজ সংগঠনের উপর ন্যস্ত করাই অর্থনৈতিক সমস্যার যথার্থ সমাধান। বাহ্যদৃষ্টিতে এ সমাধান খুবই যুক্তিসংগত বলে মনে হয়। কিন্তু এর বাস্তব কার্যকারিতার উপর যতোই গভীর দৃষ্টি ফেলবেন, ততোই এর ত্রুটিসমূহ আপনার কাছে উন্মুক্ত হতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত আপনি স্বাকীর করতে বাধ্য হবেন যে, যে রোগের চিকিৎসার জন্যে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, আসলে সে রোগটির চেয়ে এ ব্যবস্থা অধিক মারাত্মক।

নতুন শ্রেণী

একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট, উৎপাদনের উপায় উপকরণের ব্যবহার এবং উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী বণ্টনের ব্যবস্থা তত্ত্বগত দিক থেকে (Theoretically) যতোই গোটা সমাজের হাতে ন্যস্ত করার কথা বলা হোক না কেন, বাস্তবে তা একটি ক্ষুদ্র নির্বাহী সংস্থার (Executive) উপরই একান্তভাবে নির্ভর করতে হবে। প্রথমত এ ক্ষুদ্র দলটি সমাজের (Community) দ্বারাই নির্বাচিত হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু যাবতীয় অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ যখন তাদের করায়ত্ত হয়ে পড়বে এবং তাদের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করার কাজ শুরু হবে,

তখন অবশ্যই সমাজের প্রতিটি অধিবাসী তাদের মুষ্টিতে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় বন্দী হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় দেশে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করার সাহস পাবে না। তাদেরকে ক্ষমতার মসনদ থেকে হটাতে পারে, এমন সংগঠিত কোনো শক্তিই তাদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ পাবে না। কোনো ব্যক্তির উপর থেকে তাদের কৃপাদৃষ্টি উঠে গেলে সেই হতভাগার পক্ষে এ বিশাল পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার মত উপায় উপকরণ পাওয়ার কোনো অধিকারই থাকবে না। কেননা দেশের সমস্ত ধনসম্পদ ও উপায় উপকরণ তো সেই ক্ষুদ্র দলটিরই নিরংকুশ কর্তৃত্বাধীনে আবদ্ধ। তাদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বা তা অমান্য করে ধর্মঘট করার দুঃসাহস দেখানো কোনো শ্রমিক মজুরের পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ সেখানে কলকারখানা এবং ক্ষেত খামারের মালিক থাকবে একটিই—একাধিক নয় ; কাজেই একজনের কারখানায় অসুবিধা হলে আরেক মালিকের কারখানায় গিয়ে চাকুরী করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। সেখানে সারা দেশের কলকারখানা ও ক্ষেত খামারের মালিক তো কেবল সেই একটি মাত্র ক্ষুদ্র দল। সে আবার রাষ্ট্রক্ষমতারও মালিক। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার জনসমর্থন লাভের সম্ভাবনা থাকবে না। এভাবে এ অর্থনৈতিক রূপ পরিকল্পনাটির চূড়ান্ত পরিণতি এ দাঁড়াবে যে, সকল ছোট বড় পুঁজিপতি, সকল কলকারখানার মালিক এবং সকল ক্ষেত খামারের অধিকারীদের খতম করে একমাত্র বড় পুঁজিপতি, একমাত্র বৃহৎ কারখানা মালিক ও একমাত্র বিরাট জমিদার সারা দেশের উপর একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে জেঁকে বসবে। বস্তুত এ বিরাট শক্তিধর দলটি একই সাথে 'জার' ও 'কাইজারের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা

এরূপ শক্তি ও প্রভুত্ব এবং এ ধরনের নিরংকুশ কর্তৃত্ব এমন এক জিনিস, যার নেশায় মত্ত হয়ে মানুষ শোষক, অত্যাচারী ও নিপীড়ক না হয়ে পারে না। বিশেষ করে এ ধরনের কর্তৃত্বের অধিকারীরা যদি আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর সামনে একদিন নিজেদের কার্যকলাপের জবাবদিহি করার ধারণায় বিশ্বাসী না হয়, তাহলে তাদের নিপীড়নের আর কোনো সীমা পরিসীমাই থাকে না। তা সত্ত্বেও যদি ধরে নেয়া হয় যে, এরূপ সর্বময় ক্ষমতা করায়ত্ত করার পর এ ক্ষুদ্র দলটি সীমালংঘন করবে না এবং

সুবিচারের সাথেই যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে, তথাপিও এ ধরনের একটি ব্যবস্থার অধীনে ব্যক্তির পক্ষে তার ব্যক্তিত্বকে সর্বাংগীন বিকশিত করার কোনো সুযোগ থাকতে পারে না। ব্যক্তিত্বকে উন্নতি ও ক্রমবিকাশ দান করার জন্যে মানুষের প্রয়োজন স্বাধীনতা। প্রয়োজন কিছু উপায় উপকরণের অধিকারী হওয়ার—যাতে সে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা মাফিক তার ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে পারে এবং সেগুলোকে নিজের ঝোঁক প্রবণতা অনুযায়ী কাজে লাগিয়ে নিজের সুপ্ত যোগ্যতা ও প্রতিভাকে বিকশিত করে তুলতে পারে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এর কোনো সম্ভাবনা নেই। সেখানে উপায় উপকরণ ব্যক্তির আয়ত্তে থাকে না, থাকে সমাজের নির্বাহী সংস্থার হাতে। আর সেই নির্বাহী সংস্থা সমাজস্বার্থের যে ধারণা পোষণ করে সে অনুযায়ীই সেসব উপায় উপকরণকে ব্যবহার এবং প্রয়োগ করে। ব্যক্তি যদি সেই উপায় উপকরণের দ্বারা উপকৃত হতে চায়, তবে তাকে সেই সংস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ীই কাজ করতে হবে ; শুধু তাই নয়, বরঞ্চ তাদের প্রস্তাবিত সামাজিক স্বার্থে কাজ করার উপযোগীরূপে গড়ে তোলার জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাদের হাতে সোপর্দ করতে হবে, যাতে করে তারা তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাকে গড়ে তুলতে পারে। এ ব্যবস্থা কার্যত সমাজের সকল মানুষকে মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির হাতে এমনভাবে সমর্পণ করে দেয়, যেনো মানুষগুলো নিষ্প্রাণ জড়পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি সমাজের মানুষগুলোকে নিজেদের নীল নকশার ছাঁচে এমনভাবে ঢেলে সাজায় যেমনভাবে চর্মকার চামড়া কেটে জুতো তৈরি করে এবং কর্মকার লোহা গলিয়ে লৌহসামগ্রী তৈরি করে থাকে।

ব্যক্তিত্বের বলি

মানব সমাজ ও সভ্যতার জন্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা অত্যন্ত মারাত্মক। যদি ধরেও নেয়া হয় যে, এ ব্যবস্থার অধীনে প্রয়োজনীয় জীবনসামগ্রী সুবিচারের সাথেই বণ্টন করা হবে, তবু এর উপকারিতা এর ক্ষতির তুলনায় একেবারেই নগণ্য। মানুষ বিভিন্নমুখী শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতা প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে ; সেগুলো পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়া এবং সম্মিলিত সমাজ জীবনে সে অনুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করার মধ্যেই সমাজ সভ্যতার সর্বাংগীন উন্নতি নির্ভরশীল। কিন্তু এসব সুযোগ সুবিধা লাভ করা এমন ব্যবস্থার অধীনে কখনো সম্ভব

হতে পারে না, যেখানে মানুষকে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাঁচামালের মত ঢেলে কাটছাঁট করে গড়ে তোলা হয়। কতিপয় ব্যক্তি, তা তারা যতোই যোগ্য এবং সদিচ্ছাসম্পন্ন হোক না কেন, কোনো অবস্থাতেই তাদের জ্ঞান ও দৃষ্টি এতোটা সর্বব্যাপী হতে পারে না যে, লক্ষ কোটি মানুষের জন্মগত যোগ্যতা প্রতিভা এবং তাদের স্বভাবগত ঝোঁকপ্রবণতার সঠিক পরিমাপ করা এবং সেগুলোকে বিকশিত করে তোলার যথার্থ পন্থা নির্ণয় করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। এটা একেবারেই অসম্ভব। এক্ষেত্রে তারা নিছক বিজ্ঞানের দিক থেকেও ভুল করতে পারে। আর সমাজের স্বার্থ এবং সামাজিক প্রয়োজন সম্পর্কে তাদের মানসিকতায় মানব-পরিকল্পনার যে পোকা কিলবিল করছে সেদিক থেকেও তারা তাদের অধীনস্থ গোটা ভূখণ্ডের মানুষকে তাদের সেই ছাঁচেই ঢেলে সাজাতে চাইবে। এতে সমাজের যাবতীয় বৈচিত্র সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে এক প্রাণহীন সাদৃশ্য রূপান্তরিত হবে। এর ফলে বন্ধ হয়ে যাবে সমাজের স্বাভাবিক উন্নতি ও ক্রমবিকাশ আর আরম্ভ হবে এক ধরনের সম্পূর্ণ কৃত্রিম স্থবিরতা। এতে মানুষের আভ্যন্তরীণ শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতা প্রতিভাসমূহ থেৎলে যাবে। অবশেষে দেখা দেবে এক মারাত্মক সামাজিক ও নৈতিক অধপতন। মানুষ তো আর বাগানের ঘাস কিংবা গুল্মলতা নয় যে, একজন মালি তাকে কাটছাঁট করে সাজিয়ে রাখবে, আর মালির পরিকল্পনা অনুযায়ীই সে বড় হবে কিংবা ছোট হবে ! প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বতন্ত্র ক্রমোন্নতি লাভ করে তার নিজস্ব স্বাভাবিক গতিতে। এ স্বাভাবিক গতিকে হরণ করে অপর কেউ তাকে নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী চালাতে চাইলে তা ক্রমোন্নতি লাভ করতে পারে না। বরঞ্চ এঅতাবস্থায় সে হয় বিদ্রোহ করবে আর না হয় শুষ্ক মৃতপ্রায় হয়ে থাকবে।

সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক সমস্যাকে মানব জীবনের মূল সমস্যা ধরে নিয়ে গোটা মানব জীবনকে ঘানির গরুর মতো এর চারপাশে ঘুরাতে চায়। মূলত এটাই সমাজতন্ত্রের মৌলিক ভ্রান্তি। জীবনের কোনো একটি সমস্যার ক্ষেত্রেও সমাজতন্ত্রের দৃষ্টি স্বচ্ছ ও বাস্তবধর্মী নয়। বরঞ্চ সমাজতন্ত্র জীবনের সকল সমস্যাকে কেবল অর্থনীতির রংগীন চশমা দিয়েই দেখে থাকে। ধর্ম, নৈতিকতা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান মোটকথা নিজের পরিসীমার মধ্যে প্রতিটি দিক ও বিভাগকে সংকীর্ণ অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দেখা হয়। এ একরোখা এ একদেশদর্শী গোঁড়ামীপূর্ণ

দৃষ্টিভংগির কারণেই সমাজতন্ত্রের আওতায় মানব জীবনের গোটা ভারসাম্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট ও পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।

ফ্যাসিবাদের সমাধান

সুতরাং পরিষ্কার হলো যে, সমাজতান্ত্রিক মতবাদ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার কোনো সঠিক স্বাভাবিক সমাধান নয়। বরঞ্চ এ এক অস্বাভাবিক কৃত্রিম সমাধান। এর প্রতিকূলে আরেকটি সমাধান পেশ করেছে ফ্যাসিবাদ এবং জাতীয় সমাজতন্ত্র। এ মতবাদের দৃষ্টিতে জীবিকার উপকরণসমূহের উপর ব্যক্তির মালিকানা বহাল থাকবে তবে সমাজস্বার্থের খাতিরে তা রাষ্ট্রের মযবুত নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বাস্তবে এ ব্যবস্থার ফলাফল সমাজতন্ত্রের ফলাফল থেকে মোটেই ভিন্ন কিছু নয়। এ মতবাদও সমাজতন্ত্রের মতোই ব্যক্তিকে সমাজস্বার্থের কাছে বিলীন করে দেয় আর তা ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশের কোনো সুযোগই অবশিষ্ট রাখে না। তাছাড়া যে রাষ্ট্র ব্যক্তি মালিকানা ও অধিকারকে নিজ অধিকারে কুক্ষিগত করে রাখে সেতো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতোই নিপীড়ক, অত্যাচারী ও বলপ্রয়োগকারী হতে বাধ্য। একটি দেশের সকল ধনসম্পদ, ব্যবসা বাণিজ্য ও যাবতীয় উপায় উপকরণ নিজ কর্তৃত্বের অধীনে করায়ত্ত করে রাখা এবং নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল মানুষকে কাজ করতে বাধ্য করার জন্যে প্রয়োজন নিরংকুশ ক্ষমতা ও শক্তির। আর যে রাষ্ট্র এরূপ নিরংকুশ ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী হয়, তার হাতে দেশের সমগ্র অধিবাসীর সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়া এবং শাসকদের গোলামে পরিণত হওয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিত ব্যাপার।

৪. ইসলামের সমাধান

এবার আমি আপনাদের সামনে অর্থনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে ইসলাম যে সমাধান দিয়েছে তা পেশ করতে চাই।

ইসলামের মূলনীতি

ইসলাম মানব জীবনের সকল সমস্যার ক্ষেত্রে তিনটি নীতি গ্রহণ করেছে।

এক. ইসলাম মানব জীবনের স্বাভাবিক নিয়মনীতিগুলোকে যথাযথভাবে অক্ষুণ্ন রাখতে চায় এবং যেখানেই স্বাভাবিক পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটে, সেখানেই ইসলাম তার মোড় ঘুরিয়ে স্বাভাবিক পথের উপর এনে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়।

দুই. ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ ব্যবস্থায় কেবল বাহ্যিকভাবে কিছু নিয়ম বিধি চালু করে দেয়াই যথেষ্ট নয়। বরঞ্চ ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে নৈতিক চরিত্র গঠন ও মন মানসিকতার সংশোধনের উপর। কারণ এভাবেই মানব প্রবৃত্তির যাবতীয় খারাপ ও মন্দ ভাবধারার শিকড় কেটে দেয়া সম্ভব। বস্তুত এটি ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নীতি। ইসলামের সমাজ সংশোধন ও সংস্কার প্রচেষ্টার ভিত্তি এর উপরই প্রতিষ্ঠিত।

তিন. ইসলামের তৃতীয় মূলনীতি হলো, রাষ্ট্রীয় শক্তি ও আইনের প্রয়োগ কেবলমাত্র সর্বশেষ ও নিরুপায় মুহূর্তেই করা যাবে, তার পূর্বে নয়। ইসলামী শরীআতের গোটা ব্যবস্থার মধ্যেই এ মূলনীতিটির নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়।

শয়তানের কুচক্রে পড়ে মানুষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করেছে সেগুলোর সুষ্ঠু সমাধানের জন্য ইসলাম কেবলমাত্র নৈতিক সংশোধনের এবং যতোটা সম্ভব রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও আইন প্রয়োগ না করার প্রক্রিয়া অবলম্বন করে। 'জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা সাধনায় মানুষ স্বাধীন থাকবে' ; 'স্বীয় শ্রম-মেহনতের মাধ্যমে মানুষ যা উপার্জন করবে তার উপর তার স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে' এবং 'মানুষের মধ্যে তাদের যোগ্যতা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে পার্থক্য ও তারতম্য করা হবে' প্রভৃতি দৃষ্টিভংগিকে ইসলাম ততোক্ষণ পর্যন্ত স্বীকৃতি প্রদান করে, যতোক্ষণ এগুলো স্বাভাবিকতার মধ্যে অবস্থান করবে। তাছাড়া ইসলাম এগুলোর উপর এমনসব বিধি নিষেধও আরোপ করে, যা সেগুলোকে স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম করা এবং নিপীড়ন ও অবিচারের হাতিয়ারে পরিণত হওয়া থেকে বিরত রাখে।

সম্পদ উপার্জন নীতি

প্রথমে জীবিকা বা সম্পদ উপার্জনের প্রশ্নটিই ধরা যাক। ইসলাম মানুষের এ স্বাভাবিক অধিকারকে স্বীকার করে যে, সে নিজের স্বভাব প্রকৃতির

ঝোঁকপ্রবণতা এবং সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী নিজেই নিজের জীবন সামগ্রীর সন্ধান করবে। কিন্তু ইসলাম মানুষকে তার জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে নৈতিক চরিত্র বিনষ্টকারী কিংবা সমাজ ব্যবস্থা বিকৃতকারী কোনো উপায় পন্থা অবলম্বন করার অধিকার দেয়নি। ইসলাম জীবিকা উপার্জনের উপায় পন্থার ক্ষেত্রে হালাল হারামের পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। ইসলাম বেছে বেছে প্রতিটি ক্ষতিকর উপায় পন্থাকে হারাম করেছে। ইসলামী বিধান মতে মদ এবং যাবতীয় মাদকদ্রব্য কেবল হারাম নয়, বরঞ্চ এগুলোর উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় এবং সংরক্ষণও নিষিদ্ধ। যিনা ব্যভিচার, নাচগান এবং এ ধরনের অন্যান্য উপায় পন্থাকেও অর্থোপার্জনের বৈধ পন্থা বলে ইসলাম স্বীকার করে না। উপার্জনের এমনসব উপায় পন্থাকেও ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করেছে, যেগুলোতে একজনের লাভ বা স্বার্থসিদ্ধি নির্ভর করে অন্যদের কিংবা সমাজের ক্ষতি ও স্বার্থহানির উপর। ঘুষ, চুরি, জুয়া, ঠকবাজি ও প্রতারণামূলক ব্যবসা, মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মওজুদ করে রাখা, উপার্জনের উপায় উপকরণের উপর এক বা কতিপয় ব্যক্তির একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করা যাতে অন্যদের উপার্জনের চেষ্টা সাধনার পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে প্রভৃতি ধরনের উপায় পন্থা ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাছাড়া ইসলাম বেছে বেছে সেসব ব্যবসায় বাণিজ্য ও কায়কারবারকে অবৈধ ঘোষণা করেছে, যেগুলো ধরনগত দিক থেকেই বিবাদ (Litigation) সৃষ্টিকারী, কিংবা যেগুলোর লাভ লোকসান নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে ভাগ্য বা ঘটনাচক্রের উপর অথবা যেগুলোতে উভয় পক্ষের স্বার্থ ও অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ব্যবসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধিবিধান অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, বর্তমানে যেসব পন্থায় মানুষ লক্ষপতি কোটিপতি হচ্ছে, তন্মধ্যে অধিকাংশ পন্থাই এমন, যেগুলোর উপর ইসলাম কঠোর আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। ইসলাম উপার্জনের যেসব উপায় পন্থা বৈধ ঘোষণা করে, সেগুলোর পরিসীমার মধ্যে অবস্থান করে কাজ করলে সীমাহীন সম্পদ গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব।

ইসলামের স্বত্বাধিকার নীতি

কোনো ব্যক্তি বৈধ উপায়ে যে ধনসম্পদ উপার্জন করে তার উপর ইসলাম ব্যক্তির স্বত্বাধিকার অবশ্যই স্বীকার করে ; কিন্তু উপার্জিত ধনসম্পদ

ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলাম ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেয়নি। বরঞ্চ তার উপর বিভিন্নতর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। একথা সবারই জানা যে, উপার্জিত ধনসম্পদ ব্যবহার করার তিনটিই মাত্র পন্থা আছে। সেগুলো হলো ঃ

এক. খরচ বা ব্যয় করা,

দুই. লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করা এবং

তিন. মওজুদ করা।

সম্পদ ব্যবহারের এ তিনটি পন্থার উপর ইসলাম যেসব বিনিনিষেধ আরোপ করেছে এবার আমি সংক্ষেপে সেগুলো তুলে ধরছি ঃ

১. ইসলামের ব্যয়নীতি

ব্যয়ের যেসব পন্থা পদ্ধতি নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত করে কিংবা যেগুলোর দ্বারা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইসলামে তা সবই নিষিদ্ধ। কেউ জুয়া খেলে নিজের অর্থসম্পদ উড়াতে পারে না। মদ্যপান ও ব্যভিচার করার অনুমতি ইসলামে নেই। গান, বাদ্য, নৃত্য এবং বাজে আনন্দ বিহার প্রভৃতিতে কেউ নিজের অর্থকড়ি খরচ করতে পারে না। কোনো পুরুষ রেশমের পোশাক এবং সোনার অলংকার ব্যবহার করতে পারবে না। কোনোর প্রাণীর চিত্র এঁকে ঘরের দেয়াল সজ্জিত করতে পারবে না। মোটকথা, ইসলাম ব্যয়ের এমনসব দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে যার মাধ্যমে মানুষ তার প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার কাজে অর্থ ব্যয় করে।

অন্যদিকে ইসলাম অর্থ ব্যয়ের সেইসব পন্থা পদ্ধতিকে বৈধ রেখেছে, যার দ্বারা মানুষ মধ্যম ধরনের পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে পারে। এভাবে ব্যয় করার পর কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে ইসলাম তা পুণ্য ও সৎকাজে, জনকল্যাণের কাজে এবং সেইসব লোকদের সাহায্যার্থে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছে যারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করার মতো জীবিকা অর্জনে অসমর্থ। ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বোত্তম কর্মনীতি হলো, 'মানুষ হালাল পথে যাকিছু উপার্জন করবে, তা তার বৈধ ও যুক্তিসংগত প্রয়োজন পূরণার্থে ব্যয় করবে। এরপরও যাকিছু উদ্বৃত্ত থাকবে তা অভাবগ্রস্তদের

দান করবে যাতে তারা তাদের অপরিহার্য প্রয়োজনে তা খরচ করতে পারে। এ বৈশিষ্ট্যকে ইসলাম মহত্তম চরিত্রের মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করেছে এবং একটি মহান আদর্শ হিসেবে এর প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছে। সমাজে যখনই ইসলামী নৈতিকতা বিজয়ী হবে, তখন সমাজ জীবনে সেইসব লোকদেরই সর্বাধিক সম্মানের চোখে দেখা হবে যারা ন্যায় পথে এবং সৎপথে তা ব্যয় করে। পক্ষান্তরে যারা অর্থসম্পদ সঞ্চয় ও মওজুদ করে পুঞ্জিভূত করে রাখার চেষ্টা করে, কিংবা উপার্জিত সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশকে আরও সম্পদ লাভের কাজে খাটায়— সমাজে তাদের কোনো মর্যাদা ও সম্মান দেয়া হবে না।

২. অর্থপূজার মূলোচ্ছেদ

কেবল নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে এবং সমাজের নৈতিক প্রভাব ও অনুশাসনের দ্বারা অস্বাভাবিক লোভ ও লালসাপ্রাপ্ত লোকদের অপরাধ প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব নাও হতে পারে। এতোসবের পরও সমাজে এমন লোক অবশিষ্ট থাকতে পারে যারা নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থসম্পদকে আরো অধিক অর্থোপার্জনের কাজে বিনিয়োগ করতে প্রয়াস পাবে। তাই ইসলাম মানুষের এ প্রবণতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং প্রয়োজনের অধিক অর্থসম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতিপয় আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

উদ্বৃত্ত অর্থসম্পদ সুদের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করাকে ইসলামী আইনে অকাট্যভাবে হারাম করে দেয়া হয়েছে। আপনি যদি কাউকেও নিজের অর্থসম্পদ থেকে ঋণ প্রদান করে থাকেন তাহলে, ঋণগ্রহীতা ঋণের অর্থ নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে ব্যয় করুক অথবা জীবিকা উপার্জনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করুক, সর্বাবস্থায়ই আপনি কেবল আপনার মূল অর্থ ফেরত পাবারই অধিকার রাখেন, মূলের চেয়ে বেশী নয়। এমনিভাবে ইসলাম যুল্‌ম ও শোষণমূলক পুঁজিবাদী কর্মনীতির ভিত্তিমূল চূর্ণ করে দিয়েছে এবং সেই বড় হাতিয়ারটিকে সম্পূর্ণ ভোতা করে দিয়েছে যার মাধ্যমে পুঁজির মালিক শুধু তার পুঁজি খাটিয়ে সমাজের সমস্ত অর্থসম্পদ শুষে নিয়ে নিজের করায়ত্ত করার সুযোগ পায়।

কিন্তু উদ্বৃত্ত অর্থসম্পদকে নিজের ব্যবসা, শিল্প, কারিগরী কিংবা অন্যান্য কায়কারবারে বিনিয়োগ করা, অথবা অন্যদের কারবারে লাভ লোকসান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে খাটানোর প্রক্রিয়াকে ইসলাম বৈধ ঘোষণা করেছে। আর এ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনাতিরিক্ত যে সম্পদ লোকদের হাতে জমা হবে, তার মন্দ প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধ করার জন্যও ইসলাম আরও কিছু ব্যবস্থা প্রদান করেছে।

৩. সম্পদ বণ্টন ও জননিরাপত্তা

ইসলাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থসম্পদ সঞ্চয় ও মওজুদ করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলামের দাবী হলো, তোমার কাছে যাকিছু অর্থসম্পদ আছে, তা হয় নিজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় কর, না হয় কোনো বৈধ কারবারে বিনিয়োগ কর, অথবা অন্যদের দান করে দাও, যাতে তারা তা দিয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতে পারে। ইসলাম চায় এভাবে সমস্ত অর্থসম্পদ সমাজের মধ্যে অবিরাম আবর্তিত হতে থাকুক। কিন্তু যারা এ কাজ করবে না, বরঞ্চ অর্থসম্পদ জমা করতে থাকবে, তাদেরকে প্রতি বছর আইন অনুযায়ী সঞ্চিত অর্থ থেকে বার্ষিক ২.৫% ভাগ হারে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। এ অর্থ সেইসব লোকের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হবে, যারা জীবিকা উপার্জনের সংগ্রামে অংশ নেবার যোগ্য নয়, কিংবা অংশ নেয়ার পরও নিজের প্রয়োজন মেটাবার মতো উপার্জন থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। ইসলামী পরিভাষায় এ ব্যবস্থার নাম হলো যাকাত। ইসলাম যাকাত আদায় ও বণ্টনের যে ব্যবস্থা দিয়েছে তা হলো, যাকাত আদায় করে জনগণের যৌথ কোষাগারে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা বায়তুলমালে জমা করা হবে। কোষাগার সেই সমস্ত লোকের প্রয়োজন পূরণের যিম্মাদার হবে, যারাই সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে। মূলত যাকাত সামাজিক বীমার সর্বোত্তম ব্যবস্থা। সামাজিক সাহায্য সহযোগিতার সুশৃংখল ব্যবস্থাপনার অভাবে যেসব অনিষ্ট ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, বায়তুলমালের ব্যবস্থা সেগুলোর মূলোচ্ছেদ করে দেয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে জিনিস মানুষকে সম্পদ সঞ্চয় এবং লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করতে বাধ্য করে এবং যার ফলে জীবনবীমা প্রভৃতি প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলো সেখানে প্রতিটি মানুষের জীবন কেবল নিজের উপায়-উপাদানের উপরই নির্ভরশীল। সেই ব্যবস্থায় কিছু সঞ্চয়

না করলে বৃদ্ধ অবস্থায় না খেয়ে মরতে হয়। সন্তান সন্ততির জন্যে কিছু না রেখে গেলে তারা দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করেও এক টুকরা রুটি জুটাতে পারে না। কিছু সঞ্চয় না রেখে রোগাক্রান্ত হলে বিনা চিকিৎসায় মরতে হয়। এ ব্যবস্থায় যদি সঞ্চয় না থাকে আর হঠাৎ যদি ঘর পুড়ে যায়, ব্যবসা লাটে উঠে, কিংবা অন্য কোনো দুর্ঘটনায় নিপতিত হয়, তাহলে আশ্রয় বা সাহায্য পাওয়া বা নির্ভর করার কোনো আশাই থাকে না।

একইভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমজীবী মানুষ পুঁজিপতিদের ক্রীতদাসে পরিণত হতে বাধ্য হয় এবং শ্রমিকরা পুঁজিপতিদের আরোপিত যাবতীয় অন্যায় শর্ত মেনে নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়, এর কারণও এটাই যে, পুঁজিপতি শ্রমের বিনিময়ে যে মজুরী দেয় তা মেনে না নিলে শ্রমিকদের বিবস্ত্র থাকতে হবে আর অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে। পুঁজিপতির 'দান' থেকে মুখ ফিরালে শ্রমিকের জন্যে দু' বেলার অন্ন জুটানো সম্ভব হবে না।

আধুনিককালে মানব জাতির ঘাড়ে চেপে বসে আছে পুঁজিবাদের আরো এক দুষ্ট অভিশাপ। একদিকে দারিদ্র আর ক্ষুধার জ্বালায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে লক্ষ কোটি দরিদ্র অনাহারী মানুষ, আর অপরদিকে জমির অঢেল উৎপন্ন ফসল আর কারখানার উৎপাদিত বিপুল পণ্যসামগ্রীর ভাণ্ডার স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু দরিদ্র লোকদের পক্ষে তা ক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে না, ক্রয় করার ক্ষমতা তাদের নেই। এমনকি লক্ষ লক্ষ মন গম সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হচ্ছে, অথচ অনাহারী মানুষের ভাগ্যে একমুঠো খাবার জুটছে না। এ অভিশাপের প্রধান কারণ এই যে, সাহায্যের মুখাপেক্ষী মানুষের কাছে খাদ্য পৌঁছাবার মতো কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নেই। যদি এ দরিদ্র লোকদের মধ্যে ক্রয় ক্ষমতা সৃষ্টি করা হতো, তবে শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষিসহ সকল ক্ষেত্রে মানুষের দক্ষতা ও নৈপুণ্য আরো অধিক বিকশিত হতো।

ইসলাম যাকাত এবং বায়তুলমালের মাধ্যমে এ ধরনের সকল অনিষ্টের মূলোচ্ছেদ করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল প্রতিটি মুহূর্ত একজন সাহায্যকারী বন্ধুর মতো প্রত্যেক মানুষের পাশে অবস্থান করে। ভবিষ্যতের চিন্তায় চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। প্রয়োজন হলে যে

কোনো লোক বায়তুলমালে গিয়ে নিজের অধিকার আদায় করে নিতে পারে। এ অবস্থায় ব্যাংক ডিপোজিট এবং বীমা পলিসির আর কি প্রয়োজন থাকতে পারে ? হতে পারে আপনি শিশু সন্তান রেখে ইহকাল ত্যাগ করছেন। কিন্তু দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আপনি নিশ্চিন্তে পরপারে পাড়ি জমান। আপনার পরে আপনার সন্তানদের সকল দায়িত্ব বহন করবে বায়তুলমাল। রোগগ্রস্ততা, বৃদ্ধাবস্থা, আসমানী এবং যমীনী বিপদ, মোটকথা, সর্বাবস্থায় বায়তুলমাল আপনার সার্বক্ষণিক সাহায্যকারী, যার উপর নির্দ্বিধায় নির্ভর করতে পারেন। পুঁজিপতির যে কোনো অন্যায় শর্ত মেনে নিয়ে আপনাকে তার কাজ করতে বাধ্য হতে হবে না। বায়তুলমালের বর্তমানে আপনার ক্ষুধার্ত থাকা, বিবস্ত্র থাকা এবং নিরুপায় হবার কোনো ভয় নেই। তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল এমন ব্যক্তিকেই প্রয়োজনীয় জীবনসামগ্রী ক্রয় করার যোগ্য বানিয়ে দেয়, যারা অর্থ উপার্জনের সম্পূর্ণ অযোগ্য, কিংবা প্রয়োজনের চেয়ে কম উপার্জন করে থাকে। এভাবেই পণ্য উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবেই কোনো দেশের দেউলিয়াত্বকে অন্য দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার জন্যে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ানো এবং অবশেষে গ্রহলোক পর্যন্ত দৌড়াবার কোনো প্রয়োজনই অবশিষ্ট থাকবে না।

কিছু কিছু ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে পড়া অর্থসম্পদ সমাজে ছড়িয়ে দেবার জন্যে ইসলাম যাকাত ছাড়াও অন্য যে পন্থা অবলম্বন করেছে, তাহলো উত্তরাধিকার আইন। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য আইনের প্রবণতা হলো, কোনো ব্যক্তি সারা জীবন ধরে যতো অর্থসম্পদ পুঞ্জিভূত করেছে, তার মৃত্যুর পরও তাকে একইভাবে পুঞ্জিভূত রাখা। পক্ষান্তরে ইসলাম, কোনো ব্যক্তি সারা জীবন গুণে গুণে যে অর্থসম্পদ পুঞ্জিভূত করেছে, তার মৃত্যুর পর তা অন্যদের মধ্যে বিলি বণ্টন করে দেয়ার নীতি গ্রহণ করেছে। ইসলামী আইনে পুত্র, কন্যা, বাবা, মা, স্ত্রী, ভাইবোন—এরা সবাই এক ব্যক্তির উত্তরাধিকার এবং তার রেখে যাওয়া সম্পদ একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম বিধি অনুযায়ী এদের মধ্যে বণ্টিত হওয়া জরুরী। কোনো নিকটাত্মীয় বর্তমান না থাকলে দূর আত্মীয়ের সন্ধান করা হবে এবং সম্পদ তাদের মধ্যে বিলি বণ্টন করা হবে। নিকটের বা দূরের কোনো আত্মীয় যদি বর্তমান না থাকে তবে পালকপুত্র গ্রহণ করে তাকে সম্পদের একচ্ছত্র মালিক বানিয়ে দেবার অধিকার ইসলাম কাউকে প্রদান করে

না। কেউ যদি কাছের বা দূরের কোনো আত্মীয় না রেখে মারা যায়, তবে ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজই তার সমস্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী। তার পুঞ্জিভূত করে রেখে যাওয়া সমস্ত অর্থসম্পদ জাতীয় কোষাগার বায়তুলমালে জমা করা হবে। এভাবে কোনো ব্যক্তি যদি বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থসম্পদও পুঞ্জিভূত করে, তার মৃত্যুর পর দুই তিন পুরুষ সময়কালের মধ্যেই তা বহু ছোট ছোট ভাগে খণ্ড বিখণ্ড ও বিভক্ত হয়ে সমাজে ছড়িয়ে পড়বে। এমনি করে সম্পদের প্রতিটি পুঞ্জিভূত ভাণ্ডার ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত ও বিকেন্দ্রীভূত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে ঘরে ঘরে।

৫. ভাববার বিষয়

অর্থব্যবস্থার অতি ক্ষুদ্র একটি চিত্র এখানে আমি উপস্থাপন করলাম। এর উপর আপনারা চিন্তাভাবনা করে দেখুন। শয়তানের ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে ব্যক্তি মালিকানায় যেসব অনিষ্ট দেখা দেয় ইসলামী অর্থব্যবস্থা কি তা সবই বিদূরিত করে দেয় না ? তাহলে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ, কিংবা ফ্যাসিবাদী অর্থনীতি, কিংবা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণ করে অর্থব্যবস্থার এমন কৃত্রিম প্রক্রিয়া অবলম্বন করার কোনো প্রয়োজন আছে কি ? বিশেষ করে যেসব ব্যবস্থা কোনো একটি অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম তো নয়ই, বরঞ্চ তদস্থলে সৃষ্টি করে আরো অসংখ্য বিপর্যয়। এখানে আমি পুরো ইসলামী অর্থব্যবস্থার কথা আলোচনা করিনি। ভূমি ব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক বিরোধের (Trade Disputes) মীমাংসা এবং শিল্প ও কৃষির জন্যে ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী পুঁজি সংগ্রহ সরবরাহের যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যেতে পারে এবং যার পূর্ণ অবকাশ ইসলামে রয়েছে তার পূর্ণাংগ রূপরেখা এ স্বল্প পরিসরে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ইসলাম যেভাবে আমদানী রফতানী শুল্ক এবং দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়িক পণ্যের চলাচলের উপর শুল্কের কড়াকড়ি শিথিল করে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর অবাধ চলাচল ও বিনিময়ের পথ উন্মুক্ত করেছে, সে বিষয়েও আমি এ নিবন্ধে আলোচনা করতে পারিনি। এগুলোর চেয়ে একটি বড় বিষয় এখানে বলার সুযোগ পাইনি। তাহলো রাষ্ট্র পরিচালনা, সিভিল সার্ভিস এবং সামরিক খাতে যথাসম্ভব ব্যয় সংকোচন করে এবং আদালতের স্টাম্প ডিউটি প্রথার মূলোচ্ছেদ করে ইসলাম সমাজের ঘাড় থেকে বিরাট অর্থনৈতিক বোঝা

হালকা করে দিয়েছে। করলব্ধ আয়কে মাথাভারী প্রশাসনিক খাতে ব্যয় করার পরিবর্তে সমাজের কল্যাণ ও সুখ শান্তির কাজে ব্যয় করার বিরাট সুযোগ ইসলাম করে দিয়েছে। এগুলোর ফলে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানব সমাজের জন্যে পরিণত হয় এক বিরাট রহমত ও আশীর্বাদে। অন্ধ বিদ্বেষ পরিহার করে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অজ্ঞতাপূর্ণ সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি এবং পৃথিবী ব্যাপী প্রতিষ্ঠিত ইসলাম বিরোধী শাসনব্যবস্থার তীব্র প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যদি স্বাধীন বিবেক বিবেচনার দৃষ্টিতে ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে অধ্যয়ন করা হয় তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস একজন বিবেকবান ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকেও এমন পাওয়া যাবে না, যিনি মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্যে এ ব্যবস্থাকে অধিকতর উপকারী, বিশুদ্ধ ও যুক্তিসংগত বলে স্বীকার করবেন না। কিন্তু কারো মনমগজে যদি এরূপ কোনো ভ্রান্ত ধারণা জন্ম নেয় যে, ইসলামের গোটা বিশ্বাসগত, নৈতিক চরিত্রগত এবং সমাজ ব্যবস্থাগত কাঠামোর মধ্য থেকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে সাফল্যের সাথে পরিচালনা করা যেতে পারে, তবে আমি নিবেদন করবো, দয়া করে এ ভ্রান্ত ধারণা মনমগজ থেকে ধুয়ে মুছে বের করে ফেলুন। ইসলামের অর্থনীতি এর রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, আইন ও বিচার বিভাগীয় এবং সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর এসবগুলোর ভিত্তি ইসলামের নৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ নৈতিক ব্যবস্থাও আবার স্বয়ংক্রিয় নয়। বরঞ্চ তা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এক সর্বজ্ঞানী সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর সামনে জবাবদিহি করার দৃঢ় বিশ্বাসের উপর। মৃত্যুর পর আখিরাতে আল্লাহর আদালতে পার্থিব জীবনের সমস্ত কার্যকলাপ বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা হবে এবং এ বিচার অনুযায়ী শাস্তি অথবা পুরস্কার লাভের উপর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে হবে। স্বীকার করে নিতে হবে মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নৈতিক ও আইনগত যে বিধি ব্যবস্থা পৌঁছে দিয়েছেন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার একটি অংশ, তা পরিপূর্ণরূপে আল্লাহরই হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ আকীদা বিশ্বাস, নৈতিক ব্যবস্থা এবং পূর্ণাংগ জীবন যাপন পদ্ধতিকে হুবহু গ্রহণ না করলে শুধুমাত্র ইসলামের অর্থব্যবস্থা তার সঠিক স্পিরিট অনুযায়ী একদিনও চলতে পারবে না এবং তা দ্বারা সত্যিকার কোনো কল্যাণ লাভ করা সম্ভব হবে না।

৬. ইসলামের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভংগির সারকথা[১]

মানুষের অর্থনৈতিক জীবন সুবিচার ও সততার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে ইসলাম কতিপয় মূলনীতি ও সীমা চৌহদ্দি নির্ধারণ করে দিয়েছে। সম্পদের উৎপাদন, ব্যবহার ও বিনিয়োগের গোটা ব্যবস্থা এ সীমারেখার মধ্যে আবর্তিত হতে হবে। অবশ্য উৎপাদন ও বিনিয়োগ বিপণনের পন্থা পদ্ধতি কিরূপ হবে সে ব্যাপারে ইসলামের কোনো বক্তব্য নেই। কারণ সময় ও সভ্যতার উত্থান পতনের সাথে সাথে এসব পন্থা পদ্ধতি নির্ণিত ও পরিবর্তিত হয়ে থাকে। বস্তুত, মানুষের অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এগুলো নির্ধারিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ইসলামের দাবী শুধু এতটুকু যে, সকল যুগ ও পরিবেশে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী যে রূপই ধারণ করুক না কেন, তাতে ইসলামের নির্দিষ্ট নীতিমালা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং এর নির্ধারিত সীমারেখা অবশ্যি অনুবর্তন করতে হবে।

ইসলামের বিঘোষিত দৃষ্টিভংগি হলো, এ বিশ্বজগত এবং এর যাবতীয় সম্পদ মহান আল্লাহ্ গোটা মানব জাতির কল্যাণের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। তাই পৃথিবীর বুক থেকে স্বীয় জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করার অধিকার প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। এ অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান অংশীদার। কোনো মানুষকে তার জন্মগত এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে না। .এক্ষেত্রে একজন অন্যজনের উপর অগ্রাধিকারও পেতে পারে না। কোনো ব্যক্তি, বংশ, জাতি বা শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের উপর এমন কোনো বিধি-নিষেধও আরোপ করা যেতে পারে না যার ফলে তারা জীবিকার উপকরণের মধ্য থেকে কোনো কোনো উপকরণ ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে অথবা কোনো বিশেষ পেশা গ্রহণের দরজা তাদের জন্যে বন্ধ থাকবে। একইভাবে আইনত এমন কোনো বৈষম্য সৃষ্টি করাও বৈধ হতে পারে না যার কারণে জীবিকার উপকরণসমূহ বিশেষ কোনো শ্রেণী, বংশ, জাতি বা পরিবারের একচেটিয়া ইজারায় পরিণত হয়ে যাবে। আল্লাহর সৃষ্ট এ বিশ্বে তাঁরই দেয়া জীবিকার উপকরণসমূহের মধ্য থেকে নিজের অংশ লাভের চেষ্টা

১. ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ রেডিও পাকিস্তান [লাহোর] ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিষয়ে গ্রন্থকারের যে কথিকা প্রচার করেছিল, বিষয়বস্তু সামঞ্জস্যের কারণে সেটিকে এখানে সংযুক্ত করা হলো।–অনুবাদক

করায় প্রতিটি মানুষের অধিকার সমান। এ অধিকার লাভের সুযোগ সবার জন্যে সমভাবে উন্মুক্ত থাকতে হবে।

আল্লাহর দেয়া যেসব সম্পদ উৎপাদন করা কিংবা কার্যোপযোগী বানানোর ক্ষেত্রে কারো শ্রম বা যোগ্যতার বিনিয়োগ করতে হয় না তা সকল মানুষের জন্যে সাধারণভাবে বৈধ। নিজের প্রয়োজন অনুপাতে তা থেকে উপকৃত হবার অধিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে। নদীনালা ও সমুদ্রের পানি, বনের কাঠ, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় উদগত ও লালিত গাছের ফল ফসল, স্বজাত ঘাস ও চারা, বায়ু, পানি, বিজন বনের পশু, যমীনের উপর ভেসে উঠা খনিজ পদার্থ ইত্যাদি ধরনের সম্পদের উপর কারো একচেটিয়া মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এগুলোর উপর এমন কোনো বিধিনিষেধও আরোপ করা যেতে পারে না যার ফলে আল্লাহর বান্দারা কিছু ব্যয় করা ছাড়াই তা থেকে নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে বাধাগ্রস্ত হবে। তবে হ্যাঁ, যারা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এসব সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার করতে চাইবে, তাদের উপর করারোপ করা যেতে পারে।

আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণের জন্যে যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো অনুৎপাদনশীল ও পতিত ফেলে রাখা উচিত নয়। 'হয় নিজে সেগুলো দ্বারা লাভবান হও, অথবা অন্যরা যাতে উপকৃত হতে পারে সে জন্যে ছেড়ে দাও।' এ মূলনীতির ভিত্তিতে ইসলামী শরীআত ফায়সালা দিয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি সরকার প্রদত্ত জমি তিন বছরের বেশী পতিত ফেলে রাখতে পারবে না। যদি সে নিজে সে জমিতে খামার বা নির্মাণ কাজ না করে, কিংবা অন্য কোনো কাজে তা ব্যবহার না করে, তবে তিন বছর অতিক্রান্ত হবার পর তা পরিত্যক্ত ভূমি বলে গণ্য হবে এবং অপর কেউ তা কাজে লাগালে তাকে সেখান থেকে উৎখাত করা যাবে না। জমি তিন বছর পতিত ফেলে রাখলে সরকার সে জমি ফেরত নিয়ে নেবার অধিকার লাভ করবে এবং অপর কাউকে তা ব্যবহার করার জন্যে প্রদান করতে পারবে।

কেউ যদি সরাসরি প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে কোনো জিনিস সংগ্রহ বা আহরণ করে এবং নিজের শ্রম ও যোগ্যতা খাটিয়ে একে ব্যবহার উপযোগী করে তোলে, তবে সে-ই হবে সে জিনিসের মালিক। যেমন, যে পতিত জমির উপর এখনো কারো মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কেউ

যদি তা অধিগ্রহণ করে এবং কোনো লাভজনক কাজে ব্যবহার করতে শুরু করে, তবে তাকে সে জমি থেকে বেদখল করা যেতে পারে না। বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিভংগি অনুযায়ী পৃথিবীতে স্বত্বাধিকারের সূচনা হয়েছে নিম্নরূপে ঃ প্রথমে যখন পৃথিবীতে মানুষের বসবাস আরম্ভ হয়, তখন সকল জিনিস সকল মানুষের জন্যে সমানভাবে বৈধ ছিলো। অতপর যে ব্যক্তি যে বৈধ জিনিস নিজের মালিকানায় গ্রহণ করে কোনো না কোনো প্রক্রিয়ায় তাকে ব্যবহার উপযোগী করে নিয়েছে, সে-ই হয়েছে সে সম্পদের মালিক। অর্থাৎ সে জিনিসের ব্যবহার কেবল তার নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং অপরকে ব্যবহার করতে দেয়ার ক্ষেত্রে সে বিনিময় গ্রহণ করার অধিকার লাভ করেছে। এ হলো মানুষের গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক ভিত্তি। এ ভিত্তি এর নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকা অপরিহার্য।

শরীয়াতসম্মত বৈধ পন্থায় পৃথিবীতে যে স্বত্বাধিকার অর্জিত হয়, তা অবশ্যই সম্মানযোগ্য। এ ব্যাপারে মতভেদ থাকলে তা কেবল এতটুকু থাকতে পারে যে, মালিকানা অর্জন আইনগতভাবে বিশুদ্ধ হয়েছে কিনা ! আইনগতভাবে যেসব মালিকানা অবৈধ, সেগুলো অবশ্যি খতম করতে হবে। কিন্তু শরীয়াতসম্মত বৈধ মালিকানা হরণ করার অধিকার কোনো সরকার বা আইন পরিষদের নেই। এমনকি, কোনো মালিকের শরীয়াতসম্মত অধিকারে কমবেশী করার অধিকারও কাউকে দেয়া হয়নি। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের নামে এমন কোনো ব্যবস্থা কায়েম করা যেতে পারে না, যা জনগণের শরীয়াত প্রদত্ত অধিকারকে পদদলিত করে। সমষ্টির কল্যাণে ব্যক্তির মালিকানার উপর স্বয়ং শরীয়াত যে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, তাতে হ্রাস করা যতো বড় অন্যায় সংযোজন করাও ঠিক ততো বড় যুল্‌ম। ব্যক্তির শরীয়াত প্রদত্ত অধিকার সংরক্ষণ করা এবং তা থেকে শরীয়াত নির্ধারিত সামষ্টিক অধিকার আদায় করা ইসলামী সরকারের অন্যতম কর্তব্য।

আল্লাহ তাআলা তার দান ও অনুগ্রহসমূহ বণ্টনের ক্ষেত্রে সাম্যনীতি গ্রহণ করেননি। বরঞ্চ নিজের মহাপ্রজ্ঞার ভিত্তিতে কিছু মানুষকে অপর কিছু মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সৌন্দর্য, সুন্দর কণ্ঠস্বর, সুস্থতা, দৈহিক শক্তি, মেধা, জন্মগত পরিবেশ এবং অনুরূপ অপরাপর জিনিস সব মানুষকে সমভাবে প্রদান করা হয়নি। অনুরূপভাবে জীবিকার ব্যাপারেও

এ একই কথা প্রযোজ্য। মানুষের মধ্যে জীবিকার তারতম্য হওয়া আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতিরই দাবী। সুতরাং মানুষের মধ্যে কৃত্রিম অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে যতো কর্মকৌশলই গ্রহণ করা হোক না কেন, ইসলামের দৃষ্টিতে, লক্ষ্য ও মূলনীতির দিক থেকে তা সবই ভ্রান্ত। ইসলাম যে সাম্যের সমর্থক, তা জীবিকার ক্ষেত্রে নয় বরঞ্চ জীবিকা লাভের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধার সাম্য। ইসলাম চায়, সমাজে এমন কোনো আইনগত ও প্রথাগত প্রতিবন্ধকতা অবশিষ্ট না থাকুক, যার কারণে কোনো ব্যক্তি নিজের শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ উপার্জনের চেষ্টা সাধনার পথে বাধার সম্মুখীন হবে। অপরদিকে কোনো শ্রেণী, বংশ বা পরিবারের জন্মগত সৌভাগ্যকে আইনের দ্বারা স্থায়ী করার মতো বৈষম্যমূলক নীতিও ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এ দুটি পন্থা মানুষে মানুষে স্বাভাবিক প্রকৃতিগত বৈষম্যের স্থলে মানব সমাজে একটি জবরদস্তিমূলক কৃত্রিম বৈষম্যের সৃষ্টি করে। তাই ইসলাম এসব প্রথা ও আইনকে নির্মূল করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এমন একটি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে যেখানে প্রতিটি মানুষের জন্যে জীবিকা উপার্জনের সুযোগ সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। কিন্তু যারা জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে চেষ্টা করার মাধ্যম এবং ফলাফল লাভের ব্যাপারে সব মানুষকে জবরদস্তিমূলক একই সমতলে নিয়ে আসতে চায়, ইসলাম তাদের সাথে একমত নয়। কেননা, তারা প্রাকৃতিক অসাম্যকে কৃত্রিম সাম্যে রূপান্তরিত করার অসাধ্য সাধন করতে চায়। বস্তুত প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল ব্যবস্থা তো কেবল সেটাই হতে পারে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে, ঠিক সেই স্থান এবং পরিবেশ থেকে যাত্রা শুরু করবে, যেখানে আল্লাহ তাআলা তাকে সৃষ্টি করেছেন। যে মটরগাড়ী নিয়ে জন্ম নিয়েছে, সে মটরগাড়ী নিয়ে যাত্রা শুরু করবে, যে কেবল দু পা নিয়ে এসেছে সে পদদলে চলতে আরম্ভ করবে, আর যে খোড়া হয়ে জন্ম নিয়েছে তাকে খোড়া অবস্থায়ই যাত্রা শুরু করতে দিতে হবে। সমাজে এমন আইন ও প্রথা কোনো অবস্থাতেই চালু হওয়া এবং চালু থাকা উচিত নয়, যার ফলে মটরগাড়ী নিয়ে জন্ম নেয়া ব্যক্তি অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কেবল আইন ও প্রথার বলে চিরদিনই মটরগাড়ীর মালিক থাকবে এবং পংগু হয়ে জন্ম নেয়া লোকেরা আইন প্রথার বাধা ডিঙ্গিয়ে কোনোদিনই মটরগাড়ীর মালিক হতে পারবে না।

অপরপক্ষে সমাজে এমন ব্যবস্থা থাকাও কিছুতেই সমীচীন নয় যে, সকল মানুষকে বাধ্যতামূলকভাবে একই স্থান এবং পরিবেশ থেকে যাত্রা শুরু করতে হবে এবং সমগ্র পথে সকলকে একই সাথে গ্রথিত থাকতে হবে। বরঞ্চ সমাজের আইন ও প্রথাগত ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত এবং সাধারণভাবে এ সম্ভাবনা উন্মুক্ত থাকা আবশ্যক যাতে, কোনো ব্যক্তি পংগু অবস্থায় যাত্রা শুরু করা সত্ত্বেও যদি মটরগাড়ী লাভ করার মতো শ্রম, যোগ্যতা প্রতিভা তার থাকে তাহলে অবশ্যই যেন সে মটরগাড়ীর মালিক হতে পারে। অপরদিকে কেউ মটরগাড়ী দিয়ে যাত্রা শুরু করেও যদিও নিজের অযোগ্যতার কারণে মটরগাড়ী হারিয়ে ফেলে, তবে তার সে অযোগ্যতার ফলও তার পাওয়া উচিত।

ইসলাম কেবল এতোটুকুই চায় না যে, সমাজ জীবন কেবল অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত এবং অবাধ থাকবে ; বরঞ্চ সেই সাথে এটাও চায় যে, এ ময়দানে প্রতিযোগীগণ পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠুর ও নির্দয় হবার পরিবর্তে সহমর্মী ও সহযোগী হবে। ইসলাম একদিকে নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে অক্ষম ও পিছে পড়ে থাকা মানুষের আশ্রয় প্রদানের মানসিকতা সৃষ্টি করতে চায় ; অপরদিকে সমাজে এমন একটি শক্তিশালী সংস্থা গড়ে তুলতে চায় যে অক্ষম ও অসহায় লোকদের সাহায্যের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। যেসব লোকের জীবিকা উপার্জনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা থাকবে না, তারা এ সংস্থা থেকে নিজেদের অংশ পাবে ; যারা দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়বে, এ সংস্থা তাদের উঠিয়ে এনে আবার চলার যোগ্য করে দেবে। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার জন্যে যাদের সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন হবে, এ সংস্থা থেকে তারা সাহায্য সহযোগিতা লাভ করবে। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম আইনগতভাবে দেশের গোটা সঞ্চিত সম্পদ থেকে বার্ষিক ২.৫% ভাগ এবং গোটা বাণিজ্যিক পুঁজি থেকে বার্ষিক ২.৫% ভাগ যাকাত সংগ্রহ করার জন্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। সমস্ত উশরী জমির উৎপন্ন ফসল থেকে ১০% ভাগ কিংবা ৫% ভাগ উশর এবং কোনো কোনো খনিজ সম্পদের উৎপাদন থেকে ২০% ভাগ যাকাত উসুল করতে বলেছে। এছাড়া গৃহপালিত পশুর উপরও বার্ষিক যাকাত আদায় করতে বলেছে। এ গোটা সম্পদ সামগ্রী ইসলাম গরীব, এতীম, বৃদ্ধ, অক্ষম, উপার্জনহীন, রোগী এবং সব ধরনের অভাবী ও দরিদ্রদের

সাহায্যার্থে ব্যবহার করতে বলেছে। এটা এমন একটা সামাজিক বীমা, যার বর্তমানে ইসলামী সমাজে কোনো ব্যক্তি জীবনযাপনের অপরিহার্য সামগ্রী থেকে কখনো বঞ্চিত থাকতে পারে না। কোনো শ্রমজীবী মানুষকে অভুক্ত থাকার ভয়ে কারখানা মালিক বা জমিদারের যে কোনো অন্যায় শর্ত মেনে নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হতে হবে না। আর উপার্জনের প্রতিযোগিতায় নামার জন্যে ন্যূনতম যে শক্তি সামর্থ্য থাকা অপরিহার্য, কোনো ব্যক্তির অবস্থাই তার চেয়ে নীচে নেমে যাবে না।

ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এমন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যাতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকে, আর সামাজিক স্বার্থের জন্যেও তার স্বাধীনতা কোনো ক্ষতির কারণ না হয় ; বরং অবশ্যি কল্যাণবহ হয়। ইসলাম এমন কোনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কাঠামো সমর্থন করে না, যা ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা ও স্বাধীনতাকে বিলীন করে দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কোনো দেশের সমুদয় উৎপাদনের উপকরণকে জাতীয়করণ করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো, দেশের সবগুলো মানুষকে সামাজিক স্বার্থের কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ করা। এমতাবস্থায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অস্তিত্ব ও উন্নতি অত্যন্ত জটিল বরং অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের জন্যে যেমন রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা প্রয়োজন তেমনি অর্থনৈতিক স্বাধীনতারও বড় বেশী দরকার। আমরা যদি ব্যক্তিত্বের মূলোৎপাটন করতে না চাই, তাহলে আমাদের সামাজিক জীবনে প্রতিটি মানুষের জন্যে এ সুযোগ অবশ্যি বর্তমান রাখতে হবে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে নিজের জীবিকা উপার্জন করে নিজের মন মানসিকতার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে এবং নিজের মানসিক ও নৈতিক তথা সমুদয় যোগ্যতাকে নিজের ঝোঁকপ্রবণতা অনুযায়ী বিকশিত করতে পারে। পরের মুষ্টিবদ্ধে রেশনের খাদ্য যতো প্রচুরই হোক না কেন, তা মানুষের জন্যে তৃপ্তিদায়ক হতে পারে না। কেননা, তাতে মনের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশে যে ক্ষতি হয়, কেবল মেদবহুল দেহ তা পূরণ করতে পারে না।

ইসলাম এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থাকে সমর্থন করে না ; অনুরূপভাবে এমন সমাজ ব্যবস্থাকেও ইসলাম সমর্থন করে না, যা ব্যক্তিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লাগামহীন স্বাধীনতা প্রদান করে এবং নিজের অবাধ

কামনা বাসনা ও স্বার্থের জন্যে সমাজকে যথেচ্ছ ক্ষতিগ্রস্ত করার সুযোগ করে দেয়। এ দুটি প্রান্তিক ব্যবস্থার মাঝখানে ইসলাম যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে তাহলো—প্রথমত, সমাজের স্বার্থে ব্যক্তির উপর কিছু দায়-দায়িত্ব এবং সীমারেখা আরোপ করা হবে। অতপর তার নিজের কর্মক্ষেত্রে তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে। ইসলাম নির্দেশিত এ সীমারেখা এবং দায়-দায়িত্বের বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই ; এখানে কেবল একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পেশ করা হচ্ছে।

প্রথমত জীবিকা উপার্জনের বিষয়টিই আলোচনা করা যাক। এক্ষেত্রে ইসলাম যতোটা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বৈধ অবৈধের পার্থক্য করেছে, বিশ্বের অন্য কোনো ব্যবস্থা তা করেনি। ইসলাম বেছে বেছে উপার্জনের সেই সকল উপায়-উপকরণ বা মাধ্যমকে অবৈধ ঘোষণা করেছে, যেগুলোর দ্বারা এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বা সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজকে নৈতিক ও বস্তুগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে স্বীয় স্বার্থ হাসিল করার সুযোগ পায়। মদ এবং মাদকদ্রব্য তৈরি ও বিক্রয় করা, বেশ্যাবৃত্তি, গান-বাজনা ও নৃত্যগীতের পেশা, জুয়া, প্রতিজ্ঞাপত্র [এক প্রকার জুয়া], লটারী, সুদ, অনুমান, প্রতারণা এবং এমন ব্যবসা যাতে এক পক্ষের লাভ নিশ্চিত এবং অপর পক্ষের লাভ অনিশ্চিত ; মূল্যবৃদ্ধির লক্ষ্যে মজুতদারী এবং অনুরূপ অন্যান্য কায়কারবার যা সমাজের জন্যে অনিষ্টকর, ইসলামী আইনে তা সবই দ্ব্যর্থহীনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বস্তুত ইসলামের অর্থনৈতিক আইন-কানুন পর্যালোচনা করলে উপার্জনের অবৈধ পন্থা-পদ্ধতির এক বিরাট তালিকা পাওয়া যাবে। এ তালিকার মধ্যে এমন পন্থা-পদ্ধতিও আছে যেগুলো প্রয়োগ করে বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষ কোটিপতি হচ্ছে ; কিন্তু ইসলাম এসব পন্থা-পদ্ধতিকে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। ইসলাম কেবল সেইসব পন্থায়ই মানুষকে উপার্জনের স্বাধীনতা প্রদান করেছে, যেগুলোর মাধ্যমে সে অন্য লোকদের প্রকৃত ও কল্যাণকর কোনো সেবা করে সুবিচারের সাথে পারিশ্রমিক লাভ করতে পারে।

ইসলাম বৈধ উপায়ে উপার্জিত সম্পদের উপর ব্যক্তির স্বত্বাধিকার স্বীকার করে। কিন্তু এ অধিকারও নিয়ন্ত্রণহীন নয়। এক্ষেত্রে ইসলাম ব্যক্তিকে তার বৈধ উপার্জন বৈধ উপায়ে ও বৈধ পথে ব্যয় করতে বাধ্য করে।

ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম এমন কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, যার ফলে ব্যক্তি সাদাসিধে ও পূত-পবিত্র জীবনযাপন অবশ্যি করতে পারবে কিন্তু বিলাসিতার জন্যে অর্থ উড়াবার সুযোগ তার থাকবে না। জাঁকজমক প্রদর্শন করে এতোটা সীমাতিক্রম করারও সুযোগ পাবে না, যার ফলে অন্যদের উপর তার প্রভুত্বের চাকা জেঁকে বসতে পারে। অপব্যয়ের অনেকগুলো খাতকে তো ইসলামী আইন সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে। আর কোনো কোনো খাতকে যদিও সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেনি, কিন্তু বাজে ও অন্যায় ব্যয় থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্যে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা ইসলামী রাষ্ট্রকে দেয়া হয়েছে।

বৈধ ও যুক্তিসংগত আয়-ব্যয়ের পর ব্যক্তির হাতে যে অর্থসম্পদ উদ্বৃত্ত থাকবে, তা সে সঞ্চয়ও করতে পারে এবং অধিক আয় উপার্জনের কাজে বিনিয়োগও করতে পারে। কিন্তু এ দুটি অধিকারের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সঞ্চয় করার ক্ষেত্রে তাকে নিসাবের অতিরিক্ত সম্পদের জন্যে বার্ষিক শতকরা আড়াই ভাগ হারে যাকাত প্রদান করতে হবে ; আর বিনিয়োগ করতে চাইলে কেবল বৈধ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। বৈধ বিনিয়োগ সরাসরি নিজেও করতে পারে ; আবার ইচ্ছা করলে অপরকে নিজের পুঁজি টাকা, জমি, যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি আকারে প্রদান করে লাভ লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসাও করতে পারে। এ উভয় পন্থায়ই বৈধ। এসব সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে কেউ যদি কোটিপতিও হয় তাতে ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তির কিছু নেই। বরঞ্চ এটা তার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বলে বিবেচিত হবে। তবে সমাজের স্বার্থে ইসলাম এরূপ ক্ষেত্রে দুটি শর্ত আরোপ করেছে ; একটি হলো, উক্ত কোটিপতিকে তার ব্যবসার যাবতীয় সম্পদের যাকাত এবং কৃষি উৎপাদনের উপর প্রদান করতে হবে। আর দ্বিতীয়টি হলো, সে তার ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প কারখানা এবং ক্ষেত খামারে যেসব লোকের সাথে অংশীদারিত্বের কিংবা পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে কর্মসম্পাদন করবে, তাদের সকলের সাথে অবশ্যি সুবিচারমূলক আচরণ করতে হবে। সে স্বয়ং যদি এ সুবিচার না করে, তবে ইসলামী রাষ্ট্র তাকে সুবিচারের জন্যে বাধ্য করবে।

এসব বৈধ সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে ব্যক্তি যে সম্পদের মালিক হবে, ইসলাম তাও দীর্ঘদিন ধরে জমা করে রাখার অনুমতি দেয়নি ; বরঞ্চ উত্তরাধিকার আইনের মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় তা বন্টন করে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। এক্ষেত্রে ইসলামী আইনের লক্ষ্য বিশ্বের অন্য সকল আইনের চেয়ে ভিন্নতর। অন্যান্য আইন চেষ্টা করে একবার যে সম্পদ অর্জিত হয়েছে, তা যেনো পুরুষানুক্রমে চিরদিন বহাল থাকে। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন অনুযায়ী ব্যক্তি সারা জীবনে যে সম্পদ সঞ্চয় করেছে, তার মৃত্যুর সাথে সাথে তা তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। নিকটাত্মীয় না থাকলে অংশ অনুপাতে দূরের আত্মীয়রা তার উত্তরাধিকারী হবে। আর দূরের কোনো আত্মীয়ও যদি না থাকে তাহলে গোটা মুসলিম সমাজ তার উত্তরাধিকার লাভ করবে। এ আইন বিরাট বিরাট সঞ্চিত পুঁজি এবং জমিদারীকে বেশীদিন টিকে থাকতে দেয় না। উল্লিখিত সকল বিধিনিষেধ সত্ত্বেও কারো সম্পদের আধিক্যের কারণে যদি সমাজে কোনো বিকৃতি সৃষ্টি হয়ও, তবে এই শেষ আঘাতই তা নির্মূল করে দেবে।

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- তাফহীমুল কুরআন (১-২০ খণ্ড)
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)
  - আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র)
- সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)
  - ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র)
- শারহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)
  - ইমাম আবু জাফর আহমদ আত তাহাবী (র)
- শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১৪ খণ্ড)
  - মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- আল কুরআনের শিক্ষা (১-২ খণ্ড)
  - আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী
- সীরাতে সরওয়ারে আলম (১-২ খণ্ড)
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- আকাশের উপর আকাশ
  - জাকির আবু জাফর
- তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
  - খলিলুর রহমান মুমিন
- ইবাদাতের মর্মকথা
  - শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া
- মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য
  - মতিউর রহমান নিজামী
- মহিলা ফিক্‌হ (১-২ খণ্ড)
  - মুহাম্মদ আতাইয়া খামিস
- আধুনিক রূপকথা
  - আনোয়ার হোসেন লালন
- আসমাউল হুসনা
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- জীবন মৃত্যু পরকাল ও আত্মার হালচাল
  - আবদুল মতীন জালালাবাদী